মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দরসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান

الأحكام الملمة
على الدروس المهمة لعامة الأمة

< Bengali - بنغالي - বাংলা >

মূল: শাইখ আবদুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায

ব্যাখ্যা: আব্দুল আযীয দাউদ আল-ফায়েয

অনুবাদ ও সম্পাদনায়:

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

الأحكام الملمة

على الدروس المهمة لعامة الأمة

أصل الكتاب: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

شرح: الشيخ عبد العزيز بن داود الفايز

ترجمة ومراجعة:

د/ ابو بكر محمد زكريا

ذاكر الله ابو الخير

সূচিপত্র

মূল গ্রন্থকারের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

যাবতীয় প্রসংশা আল্লাহর জন্য। যিনি সৃষ্টিকুলের রব। শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য। দুরূদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূলের ওপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তার পরিবার পরিজন ও সমস্ত সাহাবীগণের ওপর।

অতঃপর....

আমার এ পুস্তিকায় ইসলাম সম্পর্কে সর্বসাধারণের পক্ষে যে সব বিষয় অবগত হওয়া একান্ত অপরিহার্য, সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো। পুস্তিকাটি "মুসলিম উম্মতের সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দারসসমূহ" শিরোনামে অভিহিত করেছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন এর দ্বারা মুসলিম ভাইদের উপকৃত করেন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নেন। নিশ্চয় তিনি মহান দাতা, অতি মেহেরবান।

আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায

ভূমিকা

“নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের খারাপ পরিণতি থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার ওপর, তার পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীগণের ওপর এবং যারা কিয়ামত অবধি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের ওপর।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [ال عمران: ١٠٢]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾ [النساء : ١]

“হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আরও তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১]

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾ [الاحزاب: ٧٠، ٧١]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করল” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১]

অতঃপর....

আমাদের পিতৃতুল্য শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ.-এর লিখিত পুস্তিকা ‘আদ-দুরুসুল মুহিম্মাহ লি ‘আম্মাতিল উম্মাহ’ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর, প্রতিটি মুসলিমের জন্য আমি পুস্তিকাটির গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুধাবন করে, তা ব্যাখ্যা করার চিন্তা করি। পুস্তিকাটি উম্মতের নারী পুরুষ ও ছাত্র শিক্ষক সবার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টিকে নিয়ে আমি ইস্তেখারা করি এবং মাশায়েখদের নিকট পরামর্শ চাই। তারা আমার চিন্তাকে সমর্থন করেন এবং আমাকে উৎসাহ দেন। ফলে আমি আমার চিন্তা-দুরুসে মুহিম্মার ব্যাখ্যা করা-কে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার (শাইখ আবদুল আযীয রহ.)-এর নিকট অনুমতি চাই। তিনি আমাকে পুস্তিকাটি ব্যাখ্যার অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতার চাদরে জড়িয়ে নেন। পুস্তিকাটি ছোট হলেও এর মধ্যে শরী‘আতের যাবতীয় –ফিকহে আকবর ও ফিকহে আছগর-একত্র করা হয়েছে। এ ছাড়াও একজন মুসলিমের জন্য যে সব শর‘ঈ আখলাক ও ইসলামী আদাব পালন করা ও মেনে চলা জরুরী তাও এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আর লেখক শির্ক ও বিভিন্ন প্রকার গুনাহ হতে সতর্ক করার মাধ্যমে এ গ্রন্থখানিকে সুসম্পন্ন করেছেন। একজন মুসলিমের যে সব আকীদা-বিশ্বাস থাকা দরকার এবং যে ধরনের ইবাদাত করা জরুরী, তার সবই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পুস্তিকাটির যেমন নাম, -দুরুসুল মহিম্মাহ -ঠিক তেমনিই তার

বিষয়বস্তু। আমি এ পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা অতিরিক্ত লম্বা করি নি যাতে পাঠকের বিরক্ত হতে হয়। আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও করি নি যাতে বুঝতে কষ্ট হয়। আমি সহজ-সরল ব্যাখ্যা করেছি, যাতে মসজিদের ইমাম, যারা মসজিদে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করতে চায়, ঘরে তা'লীম করতে চায় এবং তালেবে ইলমগণ গ্রামে বা মহল্লায় তা'লীম করতে চায়, তাদের জন্য তা সহজ হয়। আমি প্রতিটি মাসআলার সাথে দলীল যোগ করা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং ব্যাখ্যাটির নামকরণ করেছি 'আল-আহকামুল মুলিম্মাহ 'আলাদ-দুরুসিল মুহিম্মাহ'। শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. কিছু কথা যোগ করেন আমি সেগুলোর নিচে দাগ দেই। যাতে পার্থক্য নির্ধারণ করা যায়। অবশেষে যে সব ভাইয়েরা এ কিতাবটি সম্পর্কে জানবেন এবং পাঠ করবেন, তাদের নিকট আমার আশা তারা যেন এ পুস্তিকাটি সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা বা মতামত দিতে কার্পণ্য না করেন। মানুষ নিজে নিজে খুব কমই সফল হয়, ভাইদের দ্বারাই অধিক উপকৃত হয়।

আল্লাহর নিকট তার সুন্দর নামসমূহ ও বড় বড় গুণাবলীর মাধ্যমে এ কামনা করি যে, তিনি যেন এ পুস্তিকাটি ও তার ব্যাখ্যা দ্বারা আমাদের উপকার করেন। আর আমার আমলটিকে যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য করার তাওফীক দেন। অনুরূপভাবে এ পুস্তিকার লেখক ও ব্যাখ্যাকারীকে যেন উত্তম বিনিময় ও সর্বোচ্চসাওয়াব দান করেন। আমাদেরকে ও লেখককে সব চেয়ে বড় জান্নাতে নবীদের সাথে, সিদ্দিকীনদের সাথে এবং শহীদদের সাথে একত্র করেন। তিনিই এর যথাযথ তত্ত্বাবধায়ক ও ক্ষমতাবান।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

আব্দুল আযীয ইবন দাউদ আল-ফায়েয

প্রথম দরস: সূরা আল-ফাতিহা ও ছোট সূরাসমূহের অধ্যয়ন:

সূরা আল-ফাতিহা এবং সূরা যালযালাহ থেকে সূরা 'আন-নাস' পর্যন্ত ছোট ছোট সূরাসমূহের যতটা সম্ভব অধ্যয়ন, বিশুদ্ধ পঠন ও মুখস্থকরণ এবং এর মধ্যে যেসব বিষয়ের অনুধাবন অপরিহার্য সেগুলোর ব্যাখ্যা জানা।

ব্যাখ্যা:

শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. -আল্লাহ তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের উপকৃত করুক এবং তাকে উত্তম বিনিময় দান করুক -প্রথম দরসে তিনি বলেন, প্রতিটি মুসলিমের জন্য জরুরী হলো, সূরা আল-ফাতিহা ও ছোট ছোট সূরাগুলো শিখে নেওয়া। কারণ, সূরা আল-ফাতিহা জানা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরয। কারণ, সূরা আল-ফাতিহা পড়া ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। যেমনি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তার প্রমাণিত।

এ সূরাগুলো যিনি শিখাবেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা তার ওপর জরুরী:

প্রথম বিষয়: যদি পড়তে না পারে তাকে পড়া শেখানো। আর যখন পড়তে পারে, তখন তাকে দ্বিতীয় ধাপে তার পড়াকে শুদ্ধ করে দেওয়া। তারপর তৃতীয় ধাপের দিক অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ সূরাগুলো মুখস্থ করিয়ে দেওয়া।

হিফয করানোর পদ্ধতি:

শিক্ষক সুন্দরভাবে তারতীলের সাথে পড়বে আর শিক্ষার্থীরা তার সাথে বার বার পড়বে যাতে তাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

তারপর শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সূরাগুলো অর্থ ও ব্যাখ্যা শেখাবে। আয়াতগুলো থেকে দু একটি শরী'আতের বিধান শেখাবে। যেমন, সূরা আল-ফাতিহা সম্পর্কে বলবে -সূরা আল-ফাতিহা পড়া সালাতের রুকন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

“যে সালাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না তার সালাতই হয় না”।[1]

অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীকে বলবে -পূর্বের উম্মত ও সালাফের নিকট এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত যে, তারা আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের ওপর ঈমান আনতেন। আল্লাহ তার নিজের জন্য এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদীসে আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করতেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার নিজের থেকে যা নিষেধ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন, তারাও তা কোনো প্রকার বিকৃতি, তুলনা, সাদৃশ্য স্থাপন, দৃষ্টান্ত ও আকৃতি বর্ণনা ছাড়াই নিষেধ করতেন। অনুরূপভাবে তাদের জানিয়ে দিবে যে ইবাদাত হলো, একটি ব্যাপক অর্থের নাম। আল্লাহ তা'আলা যে সব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কর্মকে পছন্দ করেন এবং তাতে খুশি হন, তাই ইবাদাত। সূরা আল-ফাতিহার আরও যে সব আহকাম বলে দেওয়া দরকার তা হলো, যখন কোনো ইবাদতের সাথে শির্কের সংমিশ্রণ ঘটে তখন তার ইবাদাত বাতিল ও নষ্ট হয়ে যায়।

আরও জানিয়ে দেবে যে, প্রতিটি মুসলিম কিয়ামতের স্মরণ করবে। কিয়ামতের স্মরণ একজন মুসলিমকে আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।

অনুরূপভাবে অন্যান্য সূরাগুলোকেও এভাবে প্রথমে মুখে মুখে শুদ্ধ করাবে, তারপর হিফয করাবে এবং তারপর অর্থ ও ব্যাখ্যা শিখাবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[1] বর্ণনায় সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৪; তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৭; নাসায়ী, হাদীস নং ৯১১, আবুদ দাউদ, হাদীস নং ৮২২; মুসনাদে আহমদ ৫/৩১৩।

দ্বিতীয় দরস: ইসলামের রুকন

ইসলামের পাঁচ ভিত্তি থেকে প্রথম ভিত্তির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। মনে রাখবে, ইসলামের ভিত্তিসমূহ থেকে প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো:

شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله

এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

لا اله إلا الله এর শর্তাবলীর বর্ণনাসহ শাহাদাত বাক্যদ্বয়ের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করা। 'লা-ইলাহা' দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করা হয়, তাদের সবাইকে অস্বীকার করা এবং 'ইল্লাল্লাহ' দ্বারা যাবতীয় ইবাদাত একমাত্র আল্লাহুর জন্য প্রতিষ্ঠিত করা, এতে তাঁর কোনো শরীক নেই।

ব্যাখ্যা:

প্রথমত: কালেমার অবস্থান:

এ দু'টি শাহাদাত ইসলামের রুকনসমূহের প্রথম রুকন। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.»

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর ওপর প্রতিষ্ঠিত। -এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সাওম পালন করা ও সামর্থবান ব্যক্তির জন্য বাইতুল্লাহর হজ করা"।[2]

---

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬০৯; নাসায়ী, হাদীস নং ৫০০১; মুসনাদে আহমদ ২/৯৩

তাওহীদের কালেমাকালেমাই হলো দীনের ভিত্তি ও মজবুত দূর্গ। এটাই হলো, একজন বান্দার ওপর সর্বপ্রথম ফরয| যাবতীয় আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া এ কালেমাকে মুখে স্বীকার করা ও তদনুযায়ী আমল করার ওপর নির্ভর।

দ্বিতীয়ত: এ কালেমার অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই অথবা আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো রিযিকদাতা নেই এ কথা বলা জায়েয নেই। এর কারণ একাধিক:

যেমন, মক্কার কাফিররা আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই এ কথাকে তারা অস্বীকার করতো না। তা স্বত্বেও তা তাদের কোনো উপকারে আসে নি। তারা কালেমার অর্থ বুঝতো। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের বললেন, ‘তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার উপাস্য নেই’ তখন তারা তা বলতে অস্বীকার করছিল।

বর্তমানে আমরা তাদের বিষয়ে আশ্চর্য হই, যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে অথচ তার অর্থ জানে না। তারা আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহ তথা অলী, মৃত ও মাযারকে শরীক করে। আর তারা দাবী করে আমরা তাওহীদপন্থী।

তৃতীয়ত: কালেমার রুকন।

কালিমায়ে শাহাদাতের রুকন দু’টি

এক. নাফী -অস্বীকার করা।

দুই. ইসবাত -প্রতিষ্ঠা করা।

কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, অন্য সব বস্তু থেকে ইলাহ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা। আর এক আল্লাহ যার কোনো শরীক নেই তার জন্য উলুহিয়াত (ইলাহ হওয়া) সাব্যস্ত করা।

চতুর্থত: কালেমার ফযীলত।

আল্লাহর নিকট কালেমার মহা ফযীলত ও উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। যে ব্যক্তি দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে এ কালেমা বলবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর

যে ব্যক্তি অবিশ্বাসের সাথে বলবে, তার দুনিয়া ও আখিরাতে তার জানা মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। তার (গোপন অবিশ্বাসের) হিসাব আল্লাহর ওপরই সোপর্দ। তার বিধান মুনাফিকের বিধান।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত কালেমা, যার শব্দ কম, মুখে হালকা, পাল্লায় ভারি। এ মহান কালেমার ফযীলত অনেক। হাফেয ইবন রজব রহ. স্বীয় পুস্তিকা কালেমাতুল ইখলাসে কিছু ফযীলত দলিলসহ উল্লেখ করেছেন।

যেমন,

- এটি জান্নাতের মূল্য। যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- এটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি, ক্ষমার কারণ, সর্ব উত্তম নেক কাজ, গুনাহকে দূর করে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছুতে যত পর্দা রয়েছে তা জালিয়ে দেয়।
- তা এমন একটি বাক্য, যে বলবে তাকে আল্লাহ সত্যায়ন করবে।
- তা নবীদের সর্বউত্তম বাণী, সর্বোত্তম যিকির ও আমল।
- গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।
- শয়তান থেকে থেকে হিফাযত এবং কবরের ও হাশর মাঠের ভয়াবহতা থেকে নিরাপত্তা প্রদানকারী।
- মুমিনরা যখন কবর থেকে উঠবে তখন তা তাদের নির্দেশন।
- এ কালেমার অন্যতম ফযীলত হলো, যে ব্যক্তি এ কালেমা বলবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খোলা হবে, যে দরজা দিয়ে চায় সে প্রবেশ করতে পারবে।
- গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাওয়ার এ কালেমা ওয়ালা একদিন অবশ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।[3]

---

[3] দেখুন: সালেহ আল-ফাওযানের রিসালা- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

পঞ্চমত: মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল -এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার দাবী, তার প্রতি ঈমান আনা, তার কথার ওপর বিশ্বাস করা, তার নির্দেশের আনুগত্য করা এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা। তার আদেশ নিষেধকে বড় করে দেখা এবং তার কথার ওপর আর কারও কথাকে প্রাধান্য না দেওয়া -সে যেই হোক না কেন।

ষষ্ঠত: যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয়, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা, রাসূল, আল্লাহর এমন কালেমা বা বাণী -যা মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল ও তাঁর পক্ষ থেকে আসা রূহ বা আত্মা, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক, উবাদাহ ইবন সামেতের বর্ণনা মতে তার আমল যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

“লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ” এর শর্তাবলী হলো:

১. ইলম (জ্ঞান): যা অজ্ঞতার পরিপন্থী, ২. ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস) যা সন্দেহের পরিপন্থী, ৩. ইখলাস (নিষ্ঠা) যা শির্কের পরিপন্থী, ৪. সততা যা মিথ্যার পরিপন্থী, ৫. মহব্বত (ভালোবাসা) যা বিদ্বেষের পরিপন্থী, ৬. আনুগত্য যা অবাধ্যতা বা বর্জনের পরিপন্থী, ৭. কবুল (গ্রহণ) যা প্রত্যাখ্যানের পরিপন্থী এবং ৮. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যারই ইবাদাত করা হয় তার প্রতি কুফুরী বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।

এ শর্তগুলো নিম্নোক্ত আরবি কবিতার দু'টি পঙক্তির মধ্যে একত্রে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع   محبـة وانقيـاد والقبـول لها
وزيد ثامنها الكفران منك بما   سوى الإله من الأشياء قد أُلها

“এই কালেমা সম্পর্কে জ্ঞান, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সততা, ভালোবাসা, আনুগত্য ও এর মর্মার্থ গ্রহণ করা

এ সাথে আট নম্বরে যা যোগ করা হয়, তাহলো: আল্লাহ ব্যতীত যারা অনেক মানুষের কাছে উপাস্য হয়ে আছে তাদের প্রতি তোমার কুফুরী অর্থাৎ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।”

এর সাথে محمد رسول الله “মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল” এ শাহাদাত বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ করা, এ বাক্যের দাবী হলো: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছেন সে বিষয়ে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তিনি যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন বা যা থেকে বারণ করেছেন তা পরিহার করে চলা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব বিষয় প্রবর্তন করেছেন কেবল সেগুলোর মাধ্যমেই যাবতীয় ইবাদাত সম্পাদন করা।

এরপর শিক্ষার্থীর সম্মুখে ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির অপর বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ তুলে ধরা। সেগুলো হলো ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা, ৩. যাকাত প্রদান, ৪. রমযানের সাওম পালন এবং ৫. সামর্থ্যবান লোকের পক্ষে বায়তুল্লাহর হজ পালন করা।

ব্যাখ্যা:

আলেমগণ বলেন, কালেমাতুল ইখলাসের শর্ত সাতটি। আবার কেউ কেউ বলেন আটটি।

প্রথমত: ইলম। যখন বান্দা জানল আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র একক উপাস্য, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদাত করা বাতিল এবং তদনুযায়ী আমল করল, সে অবশ্যই কালেমার অর্থ জানল। আল্লাহ বলেন,

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ١٩﴾ [محمد : ١٩]

“অতএব, জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٨٦﴾ [الزخرف: ٨٦]

“তবে তারা ছাড়া যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة »

“যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা গেল যে, সে জানে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[4]

দুই: ইয়াকীন: দৃঢ় বিশ্বাস। যে ব্যক্তি এ কালেমা বলবে, তার ওপর ওয়াজিব হলো, এর মর্মার্থ অন্তর দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করা। ‘আল্লাহই একমাত্র ইলাহ হওয়ার হকদার এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইলাহ হওয়া বাতিল’ এ কথার শুদ্ধতাকে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٤﴾ [البقرة: ٤]

“আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪]

এবং যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة»

“এ দেওয়ালের পিছনে যার সাথে তোমার সাক্ষাত হয় এবং সে ইয়াকীনের সাথে এ কথার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার

---

[4] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬৯/১।

ইলাহ নেই, তাকে তুমি জান্নাতের সু-সংবাদ দাও"।[5]

তিন: এ কালেমার দাবীগুলোকে মুখে স্বীকার ও অন্তরে কবুল করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا ١٣٦﴾ [البقرة: ١٣٦]

"তোমরা বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের ওপর।" [সূরা আল-বাকারা. আয়াত: ১৩৬]

চার: আনুগত্য করা। অর্থাৎ এ মহান কালেমার মর্মার্থের প্রতি আনুগত্য করা। সুতরাং এর অর্থ আনুগত্য ও বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ ١٢٥﴾ [النساء : ١٢٥]

"আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজকে পূর্ণ সমর্পণ করলো"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ﴾ [لقمان: ٢٢]

"আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে"। [সূরা লুকমান, আয়াত: ২২]

পাঁচ: সততা। অর্থাৎ দাওয়াত, কথা, আকীদা ও ঈমানের আল্লাহর সাথে সততা অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩﴾ [التوبة: ١١٩]

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৯]

ছয়: ইখলাস। তার থেকে যাবতীয় কথা-বার্তা ও কর্ম কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার উদ্দেশ্যে প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে অপর কারও জন্য কোনো কিছু হওয়ার অবকাশ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[5] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩১।

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۝٥﴾ [البينة: ٥]

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে”। [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه»

“আমার শাফা‘আত লাভে সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে অন্তর থেকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে।[6]

সাত: মহব্বত। এ কালেমাকে মহব্বত করা এবং কালেমার মর্মার্থ ও কালেমা দাবীসমূহকে মহব্বত করা। কালেমার দাবী অনুযায়ী আল্লাহ ও তার রাসূলকে মহব্বত করবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের মহব্বতকে সব কিছুর মহব্বতের ওপর প্রাধান্য দেবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ ۝١٦٥﴾ [البقرة: ١٦٥]

“আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৫]

আট: আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যদের ইবাদাত করা হয়, সেগুলোকে অস্বীকার করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله»

“যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের

---

[6] বুখারী, হাদীস নং ৯৯; মুসনাদে আহমদ ৩৭৩/২।

অস্বীকার করবে তার জান-মাল নিরাপদ। তার হিসাব আল্লাহর ওপর”।[7]

---

[7] সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়; হাদীস নং ২৩।

তৃতীয় দরস: ঈমানের মৌলিক ছয়টি রুকন

সেগুলো হলো:

১- ঈমান আনয়ন করা আল্লাহর তা‘আলার ওপর,

২- তাঁর ফিরিশতাগণ,

৩- তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ,

৪- তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ

৫- আখেরাতের দিনের ওপর

৬- ঈমান আনয়ন করা তাকদীরের ওপর, যার ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে।

প্রমাণ: হাদীসে জিবরীল নামে প্রসিদ্ধ হাদীস। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন,

«الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره»

“ঈমান হলো, আল্লাহর তা‘আলার ওপর, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবী-রসূলগণ, আখিরাতের দিনের ওপর ঈমান আনয়ন এবং ঈমান আনয়ন করা তাকদীরের ওপর, যার ভালো-মন্দ আল্লাহ তা‘আলার হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে তার ওপর”।[8]

এক: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা: আল্লাহর প্রতি ঈমান চারটি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১- আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর মানুষের স্বভাব, জ্ঞান, শরী‘আত ও অনুভূতি সবই প্রমাণ।

মানব স্বভাব আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ। কারণ, প্রতিটি মাখলুককে কোনো

---

[8] সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং ৮; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১০; নাসায়ী হাদীস নং ৪৯৯০; আবু দাউদ হাদীস নং ৬৪৯৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬৩; মুসনাদে আহমদ ১/২৭।

প্রকার পূর্ব তালীম ও চিন্তা ছাড়াই তার স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»

"প্রতিটি নবজাত শিশুই ইসলামী ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার মাতা-পিতা ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অগ্নি উপাসক বানায়"।[9]

যুক্তি দ্বারা প্রমাণ আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর: পূর্বের ও পরের প্রতিটি মাখলুকের জন্য একজন স্রষ্টা প্রয়োজন যিনি তাদের আবিষ্কার করবেন। কারণ, কোনো মাখলুক নিজে নিজে অস্তিত্বে আসা অসম্ভব। আকস্মিকভাবে আসাও সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বের ওপর শরী'আতের প্রমাণ: সকল আসমানি কিতাব আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন। এর মধ্যে কুরআন করীম সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব ও সবচেয়ে মহান। অনুরূপভাবে সকল নবী-রাসূলগণ এ বিষয়ে উম্মতদের সংবাদ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম -আখেরী নবী ও সকল নবীগণের ইমাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা সবাই তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং তাওহীদের বিবরণ দেন।

আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর অনুভূতির প্রমাণ: এটি দু'দিক থেকে হতে পারে:

এক. যারা আল্লাহকে ডাকে তার কাছে সাহায্য চায় তাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার বিষয় আমরা শুনি এবং প্রত্যক্ষ করি। আর এটি আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

দুই. নবীদের অলৌকিক কর্ম-কাণ্ড যেগুলোকে মু'জিযা বলা হয় যা মানুষ সরাসরি দেখতে বা শুনতে পায়, এ সব অলৌকিক কর্ম-কাণ্ড জগতের একজন স্রষ্টা, পরিচালক, তত্বাবধায়কর অস্তিত্বের ওপর অকাট্য প্রমাণ। আর তিনিই

---

[9] বুখারী, হাদীস নং ১২৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৮; তিরমিযী, হাদীস নং ২১৩৮; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭১৪; মুসনাদে আহমদ২/২৭৫।

হলেন আল্লাহ।

ঈমান বির-রুবুবিয়্যাহ: আল্লাহই একমাত্র রব তার কোনো শরীক নেই, তিনি ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী নেই। রব তিনি যার জন্য সৃষ্টির মালিকানা ও পরিচালনা। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই, তিনি ছাড়া কোনো মালিক নেই, কোনো তত্ত্বাবধায়ক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ ﴾ [الاعراف: ٥٣]

"জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ١٣﴾ [فاطر: ١٣]

"তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব। সকল কর্তৃত্ব তাঁরই, আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়"। [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৩]

উলুহিয়্যাতের ওপর ঈমান: আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মা'বুদ তার কোনো শরীক নেই। ইলাহ অর্থ মা'বুদ-উপাস্য। সম্মান ও মহব্বতের সাথে আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣﴾ [البقرة: ١٦٣]

"আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ٥٩﴾ [الاعراف: ٥٨]

"আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৮৫]

আল্লাহর নাম ও সিফাত-গুণাবলীর প্রতি ঈমান: আল্লাহ তা'আলা তার স্বীয় কিতাবে অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতে তাঁর নিজের জন্য যে সব নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করেছে তা কোনো প্রকার বিকৃতি, তুলনা, সাদৃশ্য, ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত ছাড়া আল্লাহর জন্য যথাযথভাবে তার শান অনুযায়ী সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ۝١١﴾ [الشورى: ١١]

"আর তিনি সর্বশোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আল্লাহ তা'আলা প্রতি ঈমান আনার ফলাফল:

১- আল্লাহর একত্ববাদের বাস্তবায়ন। মানবাত্মা আল্লাহ ছাড়া আর কারও সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কারও থেকে আশা করবে না, কাউকে ভয় করবে না এবং তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবে না।

২- আল্লাহর সুন্দর নাম ও মহৎ গুণাবলীর দাবী অনুযায়ী তাকে মহান বলে জানা এবং পুরোপুরি মহব্বত করা।

৩- আল্লাহ দেওয়া নির্দেশ পালন ও নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তার ইবাদতের বাস্তবায়ন করা।

দ্বিতীয়ত: ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনা

১- ফিরিশতার পরিচয়: ফিরিশতা হলো, নুর দ্বারা সৃষ্ট অদৃশ্য প্রাণী, আল্লাহর ইবাদাত কারী। রব বা ইলাহ হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে নেই। আল্লাহ তাদের নুর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের তার নির্দেশের হুবহু আনুগত্য করার যোগ্যতা ও বাস্তবায়নের শক্তি দিয়েছেন। তাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

২- ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

এক- তাদের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান।

দুই- তাদের থেকে যাদের নাম আমরা জানি (যেমন জিবরীল) তার প্রতি বিস্তারিত ঈমান আনা। আর যাদের নাম জানি না তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ঈমান

আনা।

তিন- তাদের গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনা।

চার- আল্লাহর নির্দেশে যে ফিরিশতা যে কাজে নিয়োজিত আছে বলে আমরা জানি তার প্রতি ঈমান আনা। যেমন, আমরা জানি 'মালাকুল মাওত' ফিরিশতা, মৃত্যুর সময় জান কবজ করার কাজে নিয়োজিত ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের হিদায়াতের জন্য রহমতস্বরূপ তার রাসূলদের ওপর যে সব কিতাব নাযিল করেছেন সে সব কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা।

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার দাবীসমূহ:

এক- আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে বলে বিশ্বাস করা।

দুই- যে সব আসমানি কিতাবের নাম সম্পর্কে আমরা জানি সে সব নামের প্রতি ঈমান আনা। যেমন, কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাওরাত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর অবতীর্ণ।

তিন- কিতাবসমূহের সংবাদগুলি বিশ্বাস করা। যেমন, কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং পূর্বের কিতাবসমূহের অবিকৃত সংবাদসমূহ।

চার- কিতাবসমূহের যেসব বিধান রহিত হয় নি তার হিকমত বা কারণ বুঝি বা না বুঝি তার ওপর আমল করা, তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ও তা মেনে নেওয়া। পূর্বে সকল কিতাব কুরআন দ্বারা রহিত হয়েছে এ কথা বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ ٤٨﴾ [المائدة: ٤٨]

"আর আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর ওপর তদারককারীরূপে"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৮]

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের ফলাফল:

এক- আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে কত মহান সে সম্পর্কে জানা। ফলে তিনি প্রত্যেক জাতির নিকট কিতাব পাঠিয়েছেন যা তাদের সঠিক পথ দেখায়।

দুই- শরী'আতের বিধানের মধ্যে আল্লাহর হিকমত সম্পর্কে জানা। তিনি প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের উপযোগী বিধান দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ ﴿٤٨﴾﴾ [المائدة: ٤٨]

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমরা নির্ধারণ করেছি শরী'আত ও স্পষ্ট পন্থা"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৮]

চতুর্থত: রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা

রাসূল হলো এমন মানব যার নিকট শরিয়তের অহী প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাকে তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বপ্রথম রাসূল হচ্ছেন, নূহ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পূর্বের কোনো উম্মত রাসূল শূন্য ছিল না। আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট পরিপূর্ণ শরী'আত দিয়ে অথবা পূর্বের নবীদের শরী'আতকে সংস্কার দায়িত্ব দিয়ে কোনো না কোনো নবীকে অহীসহকারে তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ ﴿٣٦﴾﴾ [النحل: ٣٦]

"আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে"। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾ [فاطر: ٢٤]

“আর এমন কোনো জাতি নেই যার কাছে সতর্ককারী আসে নি।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ২৪]

রসূলগণ বনী আদম থেকে সৃষ্ট। তাদের মধ্যে রব বা ইলাহ হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তাদের মধ্যে রয়েছে মানব প্রকৃতি-দয়া-মায়া, জীবন-মৃত্যু, মানবিক প্রয়োজন -খাওয়া-দাওয়া পান করা ইত্যাদি।

রাসূলদের প্রতি ঈমান যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে:

এক- এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের রিসালাত সত্য। তাদের যে কোনো একজনের রিসালাতকে অস্বীকার করা মানে সবার রিসালাতকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كَذَّبَتۡ قَوۡمُ نُوحٍ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٠٥﴾ [الشعراء : ١٠٥]

“নূহ সম্প্রদায়ের লোকেরা রাসূলদের অস্বীকার করল”। [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ১০৫]

দ্বিতীয়ত: তাদের থেকে যাদের আমরা নামসহকারে জানি তাদের নাম সহকারে তাদের প্রতি ঈমান আনা। যেমন- মুহাম্মদ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা ও নূহ আলাইহিমুস সালাম। এরাই হলো, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ববান রাসূল। আর যাদের নাম আমাদের জানা নেই তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ঈমান আনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ مِنۡهُم مَّن قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّن لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَۗ ٧٨﴾ [غافر: ٧٨]

“আর অবশ্যই আমরা আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো কারো কাহিনী আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি আর কারো কারো কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করি নি”। [সূরা গাফির, আয়াত: ৭৮]

তৃতীয়ত: তাদের থেকে যেসব সংবাদ শুদ্ধরূপে প্রমাণিত তার প্রতি ঈমান আনা।

চতুর্থত: আমাদের নিকট যে রাসুলকে প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শরী'আত অনুযায়ী আমল করা। ।

রাসূলদের প্রতি ঈমানের ফলাফল:

প্রথমত: আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া সম্পর্কে জানা। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট তাদের সঠিক পথের হিদায়াতের জন্য রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। যাতে তারা কীভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে তা স্পষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ত: এ মহান নি'আমত লাভের ওপর আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা।

তৃতীয়ত: রাসূলদের মহব্বত করা, তাদের সম্মান করা, তাদের যথা উপযুক্ত প্রশংসা করা। কারণ, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তারা আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বশীল এবং কল্যাণকামী।

পঞ্চমত: আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান

আখিরাত দিবস হলো কিয়ামতের দিন। যেদিন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে হিসাব কিতাব আবার প্রেরণ করবেন। এ শেষ বলা হয়, কারণ, এটি শেষ দিন-তারপর আর কোনো দিন নেই।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান যা অন্তর্ভুক্ত করে:

এক- পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান। পুনরুত্থান সত্য। কুরআন হাদীস ও মুসলিমদের ঐকমত্য এর অকাট্য প্রমাণ।

দুই- হিসাব-নিকাশের প্রতি ঈমান। একজন বান্দা হতে তার আমলের হিসাব নেওয়া হবে এবং হিসাব অনুযায়ী তাকে বিনিময় দেওয়া হবে। কুরআন, হাদীস ও মুসলিমদের ঐক্য এর অকাট্য প্রমাণ।

তৃতীয়ত: জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনা। মাখলুকের স্থায়ী গন্তব্য হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম।

এ ছাড়াও আখিরাত দিবসের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত হবে মৃত্যুর পর যা সংঘটিত হবে সবই। যেমন, ১. কবরের ফিতনা। ২. কবরের শাস্তি ও

নি‘আমত।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের ফলাফল:

এক- শেষ দিবসের শাস্তি হতে বাচার জন্য গুনাহের কর্ম করা হতে দূরে থাকা।

দুই- ঐ দিনের সাওয়াবের আশায় নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হওয়া ও লোভ করা।

তিন- দুনিয়া যা কিছু ছুটে যায় তার জন্য দুঃখ না করে, আখিরাতের নি‘আমত ও সাওয়াব লাভের আশায় মুমিনের প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ।

ষষ্ঠত: তাকদীরের প্রতি ঈমান

কদর: আল্লাহ তা‘আলা পূর্ব ইলম ও তার হিকমত অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিকুলের তাকদীর নির্ধারণ করা।

কদরের প্রতি ঈমান যা যা অন্তর্ভুক্ত করে:

এক- এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা‘আলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুর নিখুঁত জ্ঞান রাখেন। চাই তার সম্পর্ক আল্লাহর স্বীয় কর্মের সাথে হোক বা বান্দার কর্মের সাথে হোক।

দুই- এ কথার বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা‘আল্লাহ সব কিছু লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

তিন- এ কথা বিশ্বাস করা যে, সমগ্র জগতের কোনো কিছুই আল্লাহর চাওয়া বা ইচ্ছা ছাড়া সংঘটিত হয় না। চাই তা আল্লাহর স্বীয় কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা মাখলুকের কর্মের সাথে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُۗ ٦٨﴾ [القصص: ٦٨]

“আর তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং মনোনীত করেন”। [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮]

চার- এ কথার প্রতি ঈমান আনা যে, সমগ্র জগত সত্ত্বাগতভাবে, গুণাবলীতে এবং কর্মে কেবলই আল্লাহর সৃষ্টি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾ [الزمر: ٦١]

“আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬১]

কদরের প্রতি ঈমান আনার সুস্পষ্ট ফলাফল:

এক- বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করার সময় ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপর করা। কর্মের আসবাবের ওপর ভরসা না করা। কারণ, সব কিছুই আল্লাহ তা‘আলার নিয়ন্ত্রণে।

দুই- উদ্দেশ্য হাসিল হওয়াতে মানুষ আত্মতুষ্টিতে ভুগবে না। কারণ, নি‘আমত লাভ আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই কল্যাণ ও কামিয়াবির কারণকে সহজ করে দেন। আর যখন কোনো মানুষ আত্মতুষ্টিতে ভুগে তা তাকে নি‘আমতের শুকরিয়া আদায় করতে ভুলিয়ে দেয়।

তিন- আত্মার তৃপ্তি ও প্রশান্তি। কারণ, যে আল্লাহর জন্য আসমানসমূহ ও জমিনের মালিকানা তার ফায়সালা তার বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর তা তো অবশ্যই সংঘটিত হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ٢٣﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣]

“জমিনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোনো মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি নি। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না কর তার ওপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না”। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২২-২৩]

কদর বিষয়ে গোমরাহ হয়েছে দু’টি দল:

প্রথম দল: জাবারিয়্যাহ যারা বলে, বান্দা তার আমলের ওপর বাধ্য। তার আমলে তার কোনো ইরাদা-ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই।

দ্বিতীয় দল: কাদারিয়্যাহ যারা বলে, বান্দা তার আমলে স্বাধীন। তার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় সে একক। বান্দার আমল বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার কোনো প্রভাব নেই। আল্লাহ তা'আলা যে প্রতি বস্তু তার অস্তিত্বে আসার পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন তা তারা অস্বীকার করে। উভয় দলের কথাই সম্পূর্ণ বাতিল।

চতুর্থ দরস: তাওহীদ

তাওহীদের প্রকার, তাওহীদের সংজ্ঞা:

যাবতীয় ইবাদতে আল্লাহকেই উদ্দেশ্য করা।

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) তিন প্রকার। যথা:

১. তাওহীদের রবুবিয়্যাহ (আল্লাহর প্রভূত্বে তাওহীদ)

২. তাওহীদে উলুহীয়্যাহ (আল্লাহর ইবাদতে তাওহীদ)

৩. তাওহীদে আসমা ও ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ)

১- প্রভুত্বে তাওহীদ: এর অর্থ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ পাকই সবকিছুর একক স্রষ্টা, রিযিক দাতা এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। এ প্রকারের তাওহীদকে মক্কার মুশরিকরাও স্বীকার করত। কিন্তু তা স্বত্বেও তারা মুসলিম হিসেবে গণ্য হয় নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝٨٧﴾ [الزخرف: ٨٧]

"আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়"? [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৭]

২- ইবাদতে তাওহীদ: এর অর্থ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ পাকই সত্যিকার মা'বুদ, এতে তাঁর কোনো শরীক নেই। কোনো ধরনের ইবাদতে আল্লাহ কোনো শরীক নেই। যেমন, মহব্বত, ভয়, আশা করা, ভরসা করা ও দো'আ করা ইত্যাদি। এটাই কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-এর মর্মার্থ। কেননা, এর প্রকৃত অর্থ হলো: আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার আর কোনো মা'বুদ নেই। সবপ্রকার ইবাদাত যেমন, সালাত, সাওম ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা অপরিহার্য। কোনো প্রকার ইবাদাত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা বৈধ নয়। এ প্রকারের তাওহীদকেই মুশরিকরা সবাই অস্বীকার করে।

৩- নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ: এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে তার স্বীয় কিতাবে নিজ সম্পর্কে যেসব গুণাগুণ উল্লেখ করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব গুণাগুণ আল্লাহ সম্পর্কে স্বীয় বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণনা করেছেন সেসব গুণাবলীকে আল্লাহর জন্য আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও তার শান অনুযায়ী তার জন্য সাব্যস্ত করা। এ প্রকারের তাওহীদকে কতক মুশরিকও স্বীকার করত। আর কতক মুশরিক হঠকারিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ অস্বীকার করত।

এগুলোকে আল্লাহ তা'আলার শানের উপযোগী পর্যায়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে কোনো অপব্যাখ্যা, নিষ্ক্রিয়তা, উপমা অথবা বিশেষ কোনো ধরণ বা সাদৃশ্যপনার লেশ না থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন.

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾ [الاخلاص: ١، ٥]

"(হে রাসূল) বলুন! তিনিই আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো জন্ম দেন নি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি, আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

"তার মতো কেউ নেই, তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১]

কোনো কোনো আলেম তাওহীদকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন এবং নাম ও গুণাবলীর তাওহীদকে প্রভুত্বে তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। এতে কোনো বাধা নেই, কেননা, উভয় ধরনের প্রকার বিন্যাসের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট।

আর শির্ক হলো তিন প্রকার যথা: ১. বড় শির্ক ২. ছোট শির্ক এবং ৩. গোপন শির্ক।

বড় শির্ক:

বড় শির্কের ফলে মানুষের আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝٨٨﴾ [الانعام: ٨٨]

“এবং তারা যদি আল্লাহর সাথে শির্ক করে তাহলে তাদের সব কার্যক্রম নিষ্ফল হয়ে যায়।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৭৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِينَ أَن يَعۡمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ وَفِي ٱلنَّارِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ۝١٧﴾ [التوبة: ١٧]

“মুশরিকদের জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদ সংস্থানের কোনোই প্রয়োজন নেই। অথচ নিজেরা কুফুরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঐ সকল লোকদের কৃতকর্মসমূহ ধ্বংস করে দেওয়া হবে এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১৭]

এ প্রকার শির্কের ওপর কারো মৃত্যু হলে তাকে কখনও ক্ষমা করা হবে না এবং জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ۝٤٨﴾ [النساء : ٤٨]

“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা‘আলা শির্কের গুনাহ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া যা ইচ্ছা ক্ষমা দিতে পারেন”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ۝٧٢﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং তার অবস্থান হয় জাহান্নামে। অবশ্যই অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২][10]

এ প্রকার শির্কের আওতায় পড়ে মৃত লোক ও প্রতিমাকে ডাকা, তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাদের উদ্দেশ্যে মান্নত ও জবাই করা ইত্যাদি।

ছোট শির্ক:

ছোট শির্ক বলতে এমন কর্ম বুঝায় যাকে কুরআন বা হাদীসে শির্ক বলে নামকরণ করা হয়েছে, তবে তা বড় শির্কের আওতায় পড়ে না। যেমন, কোনো কোনো কাজে রিয়া বা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা, আল্লাহ এবং অমুক যা চাইছেন তা হয়েছে” বলা ইত্যাদি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»

“তোমাদের ওপর যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো ছোট শির্ক”। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেটা হলো রিয়া অর্থাৎ কপটতা। এ হাদীস ইমাম আহমদ, তাবরানী ও বায়হাকী মাহমুদ ইবন লবীদ আনছারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুরাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তাবরানী কতিপয় বিশুদ্ধ সনদে মাহমুদ ইবন লবীদ থেকে, তিনি রাফে‘ ইবন খাদীজ থেকে বর্ণনা করেছেন। অপর এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করবে, তার এ কাজ শির্ক বলে গণ্য হবে।”

---

[10] [সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৭২]

ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সনদে উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবন উমার থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করলো সে আল্লাহর সাথে কুফুরী বা শির্ক করলো"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»

"তোমরা এ কথা বল না যে আল্লাহ এবং অমুক যা চাইছেন তা-ই হয়েছে, বরং এভাবে বল 'আল্লাহ যা চাইছেন এবং পরে অমুক যা চাইছেন তা-ই হয়েছে।" এ হাদীস আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদে হুযাইফা ইবন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ প্রকার শির্ক অর্থাৎ ছোট শির্কের কারণে বান্দা ধর্মত্যাগী হয় না বা ইসলাম থেকে সে বের হয়ে যায় না এবং জাহান্নামে সে চিরস্থায়ীও থাকবে না; বরং তা অপরিহার্য্ পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী এক পাপ বিশেষ।

তৃতীয় প্রকার শির্ক: গোপন শির্ক: এর প্রমাণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীস। তিনি বলেন,

«ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجّال؟» قالوا : بلى يا رسول الله، قال: «الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه»

"হে সাহাবীগণ, আমি কি তোমাদের সেই বিষয়ের খবর দিব না, যা আমার দৃষ্টিতে তোমাদের পক্ষে মসীহ-দাজ্জাল থেকেও ভয়ঙ্কর? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বললেন, সেটা হলো গোপন

শির্ক। কোনো কোনো ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়ে নিজের সালাত সুন্দর করার চেষ্টা করে এই ভেবে যে, অপর লোক তার প্রতি তাকাচ্ছে।”

ইমাম আহমদ তার মাসনদে এ হাদীস আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

যাবতীয় শির্ক মাত্র দুই প্রকারেও বিভক্ত করা যেতে পারে: ছোট শির্ক এবং বড় শির্ক। কারণ গোপন বা গুপ্ত শির্ক ছোট এবং বড় উভয় প্রকার হতে পারে। কখনও তা বড় শির্কের পর্যায়ে পড়ে। যেমন, মুনাফিকদের শির্ক যা বড় শির্ক হিসেবে পরিগণিত। তারা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস গোপন রেখে প্রাণের ভয়ে কপটতা বা রিয়ার মাধ্যমে ইসলামের ভান করে চলে।

এভাবে গোপন শির্ক ছোট শির্কের পর্যায়েও পড়তে পারে। যেমন, ‘রিয়া’ বা ‘কপটতা’ যার উল্লেখ মাহমুদ ইবন লবীদ আনছারী ও আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে রয়েছে। আল্লাহই আমাদের তাওফীক দানকারী।

পঞ্চম দরস: ইসলামের রুকনসমূহ

ইসলামের রুকন পাঁচটি:

১- এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

২- সালাত কায়েম করা।

৩- যাকাত আদায় করা।

৪- রমযান মাসের সাওম পালন করা।

৫- সামর্থ্য ব্যক্তির জন্য বাইতুল্লাহর হজ করা।

তাওহীদ ও শির্কের প্রকারসমূহ বর্ণনা করার ইসলামের পাঁচ রুকনের আলোচনা করা আরম্ভ করেন। বিশুদ্ধ হাদীস যেটি আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবন উমার ইবন খাত্ত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তাতে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

«بُنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا».

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সাওম করা ও সামর্থবান ব্যক্তির জন্য বাইতুল্লাহর হজ করা"।[11]

(بُنِي الإسلام على خمس) এ কথার অর্থ হলো, ইসলামের খুঁটি পাঁচটি। হাদীসে ইসলামকে ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমনি ভাবে একটি ঘর খুঁটি ছাড়া স্থির থাকতে পারে না বা হয় না। অনুরূপভাবে ইসলামও তার পাঁচ খুঁটি ছাড়া

---

[11] বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬০৯ নাসায়ী, হাদীস নং ৫০০১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২/৯৩

চিন্তা করা যায় না। এ পাঁচটি খুঁটি ছাড়া ইসলামের অন্যান্য বিধান ইসলামের পূর্ণতা।

(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) এতে রয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান। মুসলিমের একটি বর্ণনায় বর্ণিত আল্লাহ তা'আলাতা'আলাকে একক জানা। অপর বর্ণনায় বর্ণিত, আল্লাহকে একক জানা, আল্লাহ ছাড়া অন্য সব ইলাহকে অস্বীকার করা।

(وإقام الصلاة) সালাত কায়েম করা। সহীহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة».

কুফর-শির্ক ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য হলো, সালাত ত্যাগ করা।[12]

মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة».

"যাবতীয় কর্ম কাণ্ডের মূল হলো ইসলাম আর ইসলামের খুঁটি হলো সালাত।[13]

আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সালাত ছাড়া ইসলামের আর কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফর বলে মনে করতেন না।

(وإيتاء الزكاة) যাকাত দেওয়া। এটি ইসলামের তৃতীয় রুকন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴿٤٣﴾﴾ [البقرة: ٤٣]

---

[12] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮২; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২০ আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৭৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৭৮; মুসনাদে আহমদ ৩/৩৭০; দারমী, হাদীস নং ১২৩৩।

[13] তিরমিযীতিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং নং ৩৯৩৭; মুসনাদে আহমদ ৫/২৩১।

“তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩]

আল্লাহ তা‘আলাতা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥]

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।; আর এটিই হলো সঠিক দীন।

(وصوم رمضان) রমযানের সাওম পালন করা। এটি ইসলামের চতুর্থ রুকন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সাওমকে ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বের উম্মতদের ওপর ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী হও।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]

(وحج البيت) বাইতুল্লাহর হজ করা। এটি ইসলামের পঞ্চম রুকন।

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [ال عمران: ٩٧]

“এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরয। আর যে কুফুরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

এ হাদীসটি ইসলামের বিধান বিষয়ে একটি মহান মূলনীতি।

ইহসানের মূল ভিত্তি: আর তাহলো তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহ পাককে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে

না পাও তাহলে তোমার এ বিশ্বাস নিয়ে ইবাদাত করা যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

ষষ্ঠ দরস: সালাতের শর্তাবলী

সালাতের শর্তাবলী, আর সেগুলো হলো নয়টি: আর তা হচ্ছে:

১. ইসলাম ২. বুদ্ধিমত্তা ৩. ভালো-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান ৪. নাপাকি দুর করা ৫. অযুঅযু করা ৬. সতরে আওরাত অর্থাৎ লজ্জাস্থানসহ শরীরের নির্ধারিত অংশ আবৃত রাখা ৭. সালাতের সময় উপস্থিত হওয়া ৮. কেবলামুখী হওয়া এবং ৯. নিয়ত করা।

ব্যাখ্যা:

ইসলামের রুকন পাঁচটি উল্লেখ করার পর, লেখক রহ. সংগত কারণেই সালাতের শর্তের আলোচনা শুরু করেন। কারণ, শাহাদাতদ্বয়ের পর সালাত ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আর শর্ত পূরণ করা ছাড়া সালাত সহীহ হয় না।

প্রথম পর্যায়ের শর্তগুলো হলো মুসলিম হওয়া, জ্ঞানী হওয়া ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। সুতরাং কাফিরের জন্য সালাত নয়। কারণ, তার আমল নষ্ট। পাগলের সালাত নেই। কারণ, সে শরী‘আতের মুকাল্লাফ নয়। এবং বাচ্চার ওপর সালাত ফরয নয়। কারণ, «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» “তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও”।[14] বর্ণিত হাদীসের এ নির্দেশনা থেকে তা-ই বুঝা যায়।

চতুর্থ শর্ত: পবিত্রতা অর্জন করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تقبل صلاة بغير طهور»

“পবিত্রতা ছাড়া সালাত গ্রহণযোগ্য নয়”।[15]

পঞ্চম শর্ত: সময় হলে সালাত আদায় করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[14] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫, মুসনাদে আহমদ ২/১৮৭।

[15] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪; তিরমিযী, হাদীস নং ১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭২।

﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ ٧٨﴾ [الاسراء: ٧٨]

"সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর"।[১৬]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به»

জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর হাদীস। যখন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বলেন, এ দুই সময়ে মাঝে সালাতের ওয়াক্ত।[17]

ষষ্ঠ শর্ত: সতর ডাকা, যাতে শরীরের চামড়া দেখা না যায়। আল্লাহ তা'আলাতা'আলা বলেন,

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ٣١﴾ [الاعراف: ٣١]

"হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»

"আল্লাহ তা'আলা কোনো মহিলার সালাত উড়না (পর্দা) ব্যতীত গ্রহণ করেন না"।[18]

অপর প্রমাণ:

«يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال «نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة»

সালমা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, "আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকারে থাকি, আর আমি এক জামায় সালাত আদায় করি। এতে আমার সালাত শুদ্ধ হবে? বললেন, হ্যাঁ। তবে

---

16 'ফজরের কুরআন' দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের সালাত।

17 মুসনাদে আহমদ এবং নাসায়ী।

18 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৪১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬৫৫।

তুমি একটি কাঁটা দিয়ে হলেও কাপড়টি সেলাই করে নেবে”।[19]

ইবনু আব্দুল বার রহ. শরীর ঢাকার সামর্থ্য থাকা সত্বেও উলঙ্গ সালাত আদায়কারীর সালাত বাতিল হওয়ার ওপর ইজমা বর্ণনা করেন।

সপ্তম শর্ত: শরীর পাক, কাপড় পাক ও সালাতের জায়গা পাক-পবিত্র থাকা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ۝٤﴾ [المدثر: ٤]

“আর তোমার কাপড়, তা পবিত্র কর”। [সূরা আল-মুদ্দাসির, আয়াত: ৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মাসিকের রক্ত সম্পর্কে বলেন,

«تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه

“তুমি তা খুটে ঝাড়ে নেবে, তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে এবং শুকিয়ে নিয়ে তাতে সালাত আদায় করবে।”[20]

অষ্টম শর্ত: কেবলামুখী হওয়া। আল্লাহ তা‘আলাতা‘আলা বলেন,

﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ ۝١٤٤﴾ [البقرة: ١٤٤]

“অতঃপর তুমি তোমার চেহারাকে মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৪]

নবম শর্ত: নিয়ত করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنما الأعمال بالنيات»

---

[19] ইমাম তিরমিযী, উভয় হাদীসকে সহীহ বলেছেন। নাসায়ী, হাদীস নং ৭৬৫, আবুদ দাউদ, হাদীস নং ৬৩২, মুসনাদে আহমদ ৪/৫৪।

[20] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯১; তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৮; নাসায়ী, হাদীস নং ২৯৩; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬২৯।

"অবশ্যই আমলের শুদ্ধতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল"।[21]

এ হলো সালাতের নয়টি শর্ত। আল্লাহই ভালো জানেন।

[21] বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭; তিরমিযী, হাদীস নং ১৬৪৭; নাসায়ী, হাদীস নং ৭৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ২২০১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২২৭।

সপ্তম দরস: সালাতের রুকন

সালাতের রুকনরুকন চৌদ্দটি আর তা হচ্ছে:

১. সমর্থ হলে দণ্ডায়মান হওয়া, ২. ইহরামের তাকবীর, ৩. সূরা আল-ফাতিহা পড়া, ৪. রুকুতে যাওয়া, ৫. রুকু থেকে উঠে সোজা দণ্ডায়মান হওয়া, ৬. সপ্তাঙ্গের উপর ভর করে সাজদাহ করা, ৭. সাজদাহ থেকে উঠা, ৮. উভয় সাজদাহর মধ্যে বসা, ৯. সালাতের সকল কর্ম সম্পাদনে স্থিরতা অবলম্বন করা, ১০. সকল রুকনরুকন ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করা, ১১. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া, ১২. তাশাহহুদ পড়া কালে বসা, ১৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দুরূদদুরূদ পড়া ১৪. ডানে ও বামে দুই সালাম প্রদান করা।

ব্যাখ্যা:

আমার শাইখ ও পিতা রহ. পূর্বের দরসে সালাতের শর্তসমূহ আলোচনা করার পর সঙ্গত কারণেই সালাতের রুকন বিষয়ে আলোচনা করেন। কারণ, শর্ত রুকনের আগেই হয়ে থাকে।

সালাতের প্রথম রুকন: সামর্থ্য থাকার শর্তে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। আল্লাহ তা‘আলাতা‘আলা বলেন,

﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨]

“আর তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮]

ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু-র হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«صل قائما»

“তুমি দাড়িয়ে সালাত আদায় কর”।[22]

এ ছাড়াও এ বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে।

দ্বিতীয় রুকন: তাকবীরে তাহরীমা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» رواه الخمسة إلا النسائي

“সালাতের চাবি-কাঠি হচ্ছে পবিত্রতা, তার তাহরীমা (বা কর্মকাণ্ড হারামকারী বস্তু হচ্ছে তাকবীর এবং সালাতের সমাপ্তি হচ্ছে সালামের মাধ্যমে”।[23]

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি এ বিষয়ের সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস। এ ছাড়া সালাতে ভুলকারী সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر»

“যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তুমি অযু কর, তারপর তুমি কিবলামুখী হও এবং আল্লাহু আকবার তাকবীর বল।[24]

তৃতীয় রুকন: সূরা ফাতিহা পড়া। উবাদাহ ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » رواه السبعة.

---

[22] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭১; নাসায়ী, হাদীস নং ১৬৬০; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৫২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১২৩১।

[23] তিরমিযী, হাদীস নং ৩; আবু দাউদ, হাদীস নং ৬১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৫; মুসনাদে আহমদ ১/১২৩।

[24] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৭; তিরমিযী, হাদীস নং নং ৩০৩; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৬০।

“সূরা আল-ফাতিহা যে পড়বে না তার সালাত হয় না”।[25]

চতুর্থ রুকন: রুকু করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ ۝٧٧﴾ [الحج: ٧٧]

“হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু‘ কর”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৭]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রাহুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সালাতে ভুলভুলকারীর হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন,

«ثم اركع حتى تطمئن راكعا»

“অতঃপর তুমি রুকু‘ কর, যাতে তুমি রুকু‘ অবস্থায় পুরোপুরি স্থির হও”।[26]

পঞ্চম রুকন: রুকু থেকে উঠে সোজা দণ্ডায়মান হওয়া। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বলেন,

«ثم ارفع حتى تعتدل قائما»

“অতঃপর তুমি মাথা উঠাও, এমনকি তুমি সোজা হয়ে দাড়াও”।[27]

এ ছাড়াও আবু মাসউদ আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود»

“যে ব্যক্তি সালাতে সে তার পিঠকে সোজা না করে তার সালাত শুদ্ধ হয় না।[28]

---

[25] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৪; তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৭; নাসায়ী, হাদীস নং ৯১১; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮২২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৩৭।

[26] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৩; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৬০।

[27] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৩; তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৩; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৬০।

[28] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫; নাসায়ী, হাদীস নং ১০২৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫৫, ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৭০।

ষষ্ঠ রুকন: সপ্তাঙ্গের উপর ভর করে সিজদা করা।

«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفق عليه.

আমাকে সাত অঙ্গের ওপর সাজদাহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কপাল, নাক-হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা, দুই হাত, দুই হাঁটু ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ।[29]

সপ্তম রুকন: সিজদা থেকে উঠা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثم ارفع حتى تطمئن جالسا»

"তারপর তুমি মাথা উঠাও এবং স্থিরতার সাথে বসো"।[30]

অষ্টম রুকন: উভয় সাজদাহর মধ্যে বসা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারী লোকটিকে বলেন,

«ثم ارفع حتى تعتدل جالسا»

"অতঃপর তুমি মাথা উঠাও এবং স্থির হয়ে বসো"।[31]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাণী, তিনি বলেন,

«كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا».

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদাহ থেকে মাথা তোলার পর পুরোপুরি না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সাজদাহ করতেন না"।[32]

---

[29] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৭৯; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৯০; তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৩; নাসায়ী, হাদীস নং ১০৯৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৮৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৮৪।

[30] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৩; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৬০।

[31] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৩; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৬০।

নবম রুকন: সালাতের সকল কর্ম সম্পাদনে স্থিরতা অবলম্বন করা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারী লোকটিকে বলেন,

«ثم اركع حتى تطمئن راكعا»

"অতঃপর তুমি রুকু' কর এবং রুকুতে স্থিরতা অবলম্বন কর"।[33]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে স্থিরতা অবলম্বন করতেন এবং তিনি বলতেন,

«صلوا كما رأيتموني أصلي»

"তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় কর"।[34]

দশম রুকন: সকল রুকন ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করা।

এগারতম রুকন: শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।

বারোতম রুকন: তাশাহ্হুদ পড়াকালে বসা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» .. إلخ الحديث

"যখন তোমরা সালাতে বসবে তখন তুমি বলবে,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [35]

---

[32] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৮; আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৮৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৩।

[33] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৩; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৬০।

[34] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৫।

“তোমরা যখন সালাতে বসবে, তখন এ দো‘আ পড়বে”।

তেরতম রুকন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দুরুদ পড়া। কা‘আব ইবন উজরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি বলেন,

«قولوا: اللَّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه السبعة.

“তুমি বল, আল্লাহুম্মা ...।”[36]

চৌদ্দতম রুকন: ডানে ও বামে দুই সালাম প্রদান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وتحليلها التسليم»

“সালাতের সমাপ্তি হলো সালাম”।[37]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উক্তি, তিনি বলেন, وكان يختم الصلاة بالتسليم، “তিনি সালাম দ্বারা সালাত শেষ করতেন”। সুতরাং সালাত থেকে হালাল হওয়ার জন্য সালামের প্রচলন রাখা হয়েছে। সালাম হলো সালাতের সমাপ্তি এবং শেষ হওয়ার আলামত”।[38]

---

[35] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২; তিরমিযী, হাদীস নং ১১০৫, নাসায়ী, হাদীস নং ১২৯৮; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৬৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৯।

[36] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৬; তিরমিযী, হাদীস নং ৪৮৩; নাসায়ী, হাদীস নং ১২৮৮; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৭৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৯০৪।

[37] তিরমিযী, হাদীস নং ৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৫।

[38] দেখুন, আস-সালসাবিল ফী মারেফাতিত-দলীল, খণ্ড ১ পৃ: ১৪৬, ১৪৮।

অষ্টম দরস: সালাতের ওয়াজিব

সালাতের ওয়াজিবসমূহ: এগুলোর সংখ্যা আট। আর তা হচ্ছে,

১. ইহ্‌রামের তাকবীর ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরগুলো

২. ইমাম এবং একাকী সালাত আদায়কারীর পক্ষে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলা।

৩. সকলের পক্ষে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد বলা

৪. রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা

৫. সাজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى বলা।

৬. উভয় সাজদার মধ্যে رَبِّ اغْفِرْ لِيْ বলা

৭. প্রথম তাশাহ্‌হুদ পড়া

৮. প্রথম তাশাহ্‌হুদ পড়ার জন্য বসা।

ব্যাখ্যা:

শাইখ রাহ. এ ধরনের সালাতের রুকন আলোচনা করার পর ওয়াজিবসমূহ আলোচনা করেছেন। রুকনগুলোর আলোচনা আগে করার কারণ হচ্ছে, ওয়াজিবের তুলনায় রুকনের গুরুত্ব অধিক। সালাতে ওয়াজিব ছুটে গেলে সাজদাহ সাহু দ্বারা সংশোধন করা যায়; কিন্তু রুকন ছুটে গেলে কোনো সংশোধন নেই। সালাত বাতিল হয়ে যাবে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়।

সালাতের প্রথম ওয়াজিব, ইহ্‌রামের তাকবীর ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরগুলো। কারণ, ইহরামের তাকবীর সালাতের রুকন।

আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদের বাণী, তিনি বলেন,

«رأيت النبي يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود».

“আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিটি উঠা, নামা, দাঁড়াতে, ও বসতে তাকবীর বলতে দেখেছি”।[39]

---

[39] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩; নাসায়ী, হাদীস নং ১৩১৯; দারেমী, হাদীস নং ১২৪৯।

দ্বিতীয় ওয়াজিব: ইমাম এবং একা নামাজীর পক্ষে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كان رسول الله ﷺ يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলতেন। তারপর যখন তিনি রুকু' করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর যখন রুকু' থেকে উঠতেন তখন বলতেন سمع الله لمن حمده তারপর দাড়িয়ে ربنا ولك الحمد বলতেন"।[40]

তৃতীয় ওয়াজিব: সকলের জন্যই رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد বলা। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

চুতুর্থ ও পঞ্চম ওয়াজিব: রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم বলা এবং সাজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে বলতেন, سبحان ربي العظيم এবং সাজদায় سبحان ربي الأعلى বলতেন।[41]

ষষ্ঠ ওয়াজিব: উভয় সাজদাহর মধ্যে رَبِّ اغْفِرْ لِيْ বলা। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই

---

[40] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৭০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯২; তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৪; নাসায়ী, হাদীস নং ১০২৩; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৩৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৬০।

[40] তিরমিযী, হাদীস নং ৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৫।

[41] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৭২; তিরমিযী, হাদীস নং ২২৬২, নাসায়ী, হাদীস নং ১১৩৩; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৭১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৮৮; ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[41] তিরমিযী, হাদীস নং ৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৫।

সাজদাহর মাঝে বলতেন رب اغفر لي، رب اغفر لي "হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"[42]

সপ্তম ওয়াজিব: প্রথম তাশাহ্হুদ পড়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد».

"যখন তুমি তোমার সালাতে দাঁড়াবে, তখন তুমি আল্লাহু আকবর বলবে, তারপর তুমি কুরআন থেকে যেখান থেকে তোমার সহজ হয় তা পড়বে। যখন তুমি সালাতের মাঝে বসবে তখন তুমি স্থির হয়ে বসবে। তুমি তোমার বাম রানকে বিছিয়ে দিবে। অতঃপর তাশাহহুদ পড়বে।"[43]

অষ্টম ওয়াজিব: প্রথম তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসা। আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله»

"তোমরা যখন দুই রাকা'আতের মাঝে বসবে তখন তোমরা আত-তাহিয়্যাত পড়।"[44] এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যোহরের সালাতে তাশাহহুদ পড়তে ভুলে যান, তখন যে বৈঠকটি তিনি ভুলে যান তার পরিবর্তে সালামের পূর্বে দু'টি সাজদাহ করেন।[45]

---

[42] নাসায়ী হাদীস নং ১১৪৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৭।

[43] তিরমিযী, হাদীস নং ৩০২; নাসায়ী, হাদীস নং ১১৩৬; মুসনাদে আহমদ ৪/৩৪০; দারেমী, হাদীস নং ১৩২৯।

[44] তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৯; নাসায়ী, হাদীস নং ১১৬৩; মুসনাদে আহমদ ১/৪৩৭, নং ৪১৬০।

[45] দেখুন, মানাবুস-সাবীল, খণ্ড: ১ পৃ: ৮৭-৮৯।

নবম দরস: তাশাহ্হুদ:

তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু এর বর্ণনা

সালাত আদায়কারী নিম্নরূপ বলবে,

«اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ»

"উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়িবাতু, আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নবিইয়ূ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা-ইবা-দিল্লাহিস সালেহীন। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

"যাবতীয় ইবাদাত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সকলই আল্লাহর জন্য, হে নবী আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণেরগণের ওপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দুরূদদুরূদ ও বরকতের দো'আ পড়তে গিয়ে বলবে:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَّجِيْدٌ. اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْد».

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা চাললি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আ-লী মুহাম্মদিন কামা ছাল্লাইকা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা-আ-লী ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিইয়ূ ওয়া আলা আলী মুহাম্মদিন কামা বা-রাকতাআলা ইবরাহীমা ওয়া আলা-আ-লী ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

“হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপর রহমত নাযিল করো, যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয় এবং বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর, তাঁর বংশধরগণের ওপর, যেমনটি নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরগণের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।”

অতঃপর সালাত আদায়কারী শেষ তাশাহ্হুদের পর আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফেতনা থেকে এবং মসীহ-দজ্জালের ফিতনা থেকে। তারপর আপন পছন্দমত আল্লাহর কাছে দো‘আ করবে, বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, দো‘আগুলো ব্যবহার করা সর্বোত্তম। তন্মধ্যে একটি হলো নিম্নরূপ:

«اَللهُمَّ أعِنِيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

«اللهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মা আ-ইনী আলা-জিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিক। আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্‌তু নাফসী জুলমান কাসীরাউ” ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্‌জুনু-বা ইল্লা আন্‌তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম্ মিন ইন্‌দিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফুরুর রাহীম।

“ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিকির, শুকরিয়া আদায় ও ভালোভাবে তোমারই ইবাদাত করার তাওফীক দাও। আর হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের ওপর অনেক বেশি যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম করো। তুমি তো মার্জনাকারী অতি দয়ালু”।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তখন বলবে,

«اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ»

তারপর মনের খুশি মতো দো‘আ করবে।[46]

ব্যাখ্যা:

তাশাহহুদ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের হাদীসটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

আবু মাসউদ আল বাদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বশীর ইবন সা‘আদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে আপনার ওপর দুরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কীভাবে দুরূদ পড়ব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, তোমরা বল,

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْراهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَّجِيْدً. اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْد»

আর সালাম তোমাদের যেমন শিখানো হয়েছে।[47]

মূলপাঠ:

তারপর শেষ তাশাহহুদে জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা, মাসীহ আদ-দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাইবে। তারপর মনের

---

[46] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২; তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৯; নাসায়ী, হাদীস নং ১১২৯৮; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৬৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৯।

[47] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৫; তিরমিযী, হাদীস নং ৩২২০; নাসায়ী, হাদীস নং ১২৮৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৭৯।

চাহিদা মোতাবেক দো'আ পছন্দ করে নিবে, বিশেষকরে যা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা থেকে

ব্যাখ্যা:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা তাশাহহুদ পড়বে তখন তোমরা চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে এবং দো'আ পড়বে।

«اللّٰهُمَّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন মৃত্যুর ফিতনা ও মাসীহ আদ-দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করি"।[48]

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাতের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দুরূদ পড়ার পর আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়া যাবে।

মূলপাঠ:

তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নিম্নোক্ত দো'আ করা:

«اللّٰهُمَّ أغني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদতের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করুন"।

অনুরূপ আরও বলবে,

« اللّٰهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »

---

[48] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৮; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬০৪; নাসায়ী, হাদীস নং ৫৫১৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৮৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৯০৯।

তবে প্রথম তাশাহহুদে আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি... থেকে দু’ শাহাদাত (আশহাদু আন লা-ইলাহা...আবদুহু ওয়ারাসূলুহু) শেষ করে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাতে তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তাতে যদি মুসল্লি দুরূদও পড়ে নেয় তবে তা আরও উত্তম। কারণ হাদীসসমূহের ব্যাপকার্থ এর সপক্ষে প্রমাণবহ। তারপর তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য দাঁড়াবে।

ব্যাখ্যা:

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

«علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: «اللَّهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »

“আমাকে একটি দো‘আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আমার সালাতে দো‘আ করবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এ দো‘আ পড়:

«اللهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»[49]

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাতের মধ্যে দো‘আ করা বৈধ। দো‘আ কবুলের অন্যতম স্থান হলো, তাশাহহুদ, দরূদ ও চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়ার পর। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন,

«ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»

“অতঃপর তার তার নিকট যেসব দো‘আ পছন্দ তা দিয়ে দো‘আ করবে”।[50]

এ হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, সালাতের মধ্যে হাদীসে বর্ণিত বা বর্ণিত

[49] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৫; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৩১; নাসায়ী, হাদীস নং ১৩০২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৩৫।

[50] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২; নাসায়ী, হাদীস নং ১২৯৮; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৬৮; দারমী, হাদীস নং ১৩৪০।

নয় সব ধরনের দো‘আ যদি তা শরী‘আত নিষিদ্ধ না হয় তবে তা করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثم ليتخير من المسألة ما شاء»

“তারপর পছন্দ অনুযায়ী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে”।[51]

[51] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২; নাসায়ী, হাদীস নং ১২৯৮; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৬৮; দারেমী, হাদীস নং ১৩৪০।

দশম দরস: সালাতের সুন্নাতসমুহ

সালাতের সুন্নতসমূহ। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

১. সালাতের শুরুতে প্রারম্ভিক দো‘আ বা তাস্‌বীহ পড়া।ব্যাখ্যা:

যেমন,

এক.

«سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ»

“হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমরা প্রশংসার সাথে। তোমরা নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা অতি সুউচ্চে এবং তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই।”

অথবা, দুই.

«اَللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ الْمُشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبِ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اَغسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بَالثَّلجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

“হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপ-রাশির মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।”

এগুলো ব্যতীত হাদীসে প্রমাণিত অন্য যে কোনো প্রারম্ভিক দো‘আ পড়লেও চলবে।

মূলপাঠ:

২. দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুর আগে ও রুকুর পরে ডান হাতের তালু বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর ধারণ করা।

৩. প্রথম তাকবীর বলার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু‘ থেকে উঠার সময় এবং প্রথম তাশাহ্হুদ শেষে তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়

অঙ্গুলীসমূহ সংযুক্ত ও সরল রেখে উভয় হাত উভয় কাঁধ বা কান বরাবর উত্তোলন করা।

৪. রুকু' এবং সাজদায় একাধিকবার তাসবীহ পড়া।

৫. রুকু থেকে উঠার পরে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' এর চেয়ে অতিরিক্ত যা বর্ণিত আছে তা পাঠ করা এবং উভয় সাজদাহর মধ্যে বসে একাধিকার মাগফিরাতের দো'আ পড়া।

৬. রুকু অবস্থায় পিঠ বরাবর মাথা রাখা।

৭. সাজদাবস্থায় বাহুদ্বয় বক্ষের উভয় পার্শ্ব থেকে এবং পেট উরুদ্বয় থেকে ব্যবধানে রাখা।

৮. সাজদাহর সময় বাহুদ্বয় জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে রাখা।

৯. প্রথম তাশাহ্হুদ পড়ার সময় ও সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা।

১০. শেষ তাশাহ্হুদে 'তাওয়াররুক' করে বসা। এর পদ্ধতি হলো, পাছার উপর বসে বাম পা ডান পায়ের নীচে রেখে ডান পা খাড়া রাখা।

১১. প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহহুদে বসার শুরু থেকে তাশাহ্হুদ পড়ার শেষ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা এবং দো'আর সময় নাড়াচাড়া করা।

১২. প্রথম তাশাহ্হুদের সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং ইবারহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর দুরূদ ও বরকতের দো'আ করা।

১৩. শেষ তাশাহ্হুদে দো'আ করা।

১৪. ফজর, জুমু'আ, উভয় ঈদ ও ইস্তেসকার সালাতে এবং মাগরিব ও ইশার সালাতের প্রথম দুই রাকা'আতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া।

১৫, যোহর ও আসরের সালাতে, মাগরিবের তৃতীয় রাকা'আতে এবং 'ইশার শেষ দুই রাকা'আতে চুপে চুপে কিরাত পড়া।

১৬. সূরা আল-ফাতিহার অতিরিক্ত কুরআন পড়া।

এর সাথে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য সুন্নাতগুলোর প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। যেমন, ইমাম, মুক্তাদী ও একাকি সালাত আদায়কারীর পক্ষে রুকু‘ থেকে উঠার পর রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ বলার সাথে অতিরিক্ত যা পড়া হয় তা ও সুন্নাত। অনুরূপভাবে রুকুতে অঙ্গুলীগুলো ফাঁক করে উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখা সুন্নাত।

ব্যাখ্যা:

সালাতের সুন্নাতসমূহকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম: কথা সুন্নাত

দ্বিতীয়: আমলী সুন্নাত

লেখক এ সুন্নাতগুলো মূল কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এ সুন্নাতগুলো আদায় করতেই হবে -এমন নয়। তবে যদি কেউ করে তাহলে সাওয়াব পাবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি না করে বা সব সুন্নাত ছেড়ে দেয় তাহলে তার হুকুম অন্যান্য সুন্নাতের মতোই। তাতে কোনো গুণাহ হবে না। তবে মুসলিমদের জন্য উচিত হলো, এ সুন্নাতের ওপর আমল করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ»

“তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর। তোমরা সেসব সুন্নাতের ওপর গোড়ালির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে অটুট অবিচল থাক”।[52] আল্লাহই ভালো জানেন।

একাদশ দরস: সালাত বাতিলের কারণসমূহ

সালাত বাতিল করে এমন বিষয় আটটি:

[52] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৭৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৪; মুসনাদে আহমদ ১২৬/৪; দারেমী, হাদীস নং ৯৫।

১. জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত কথা বলা। না জানার কারণে বা ভুলে কথা বললে তাতে সালাত বাতিল হয় না।

২. শব্দ করে হাসা, ৩. খাওয়া, ৪. পান করা, ৫. লজ্জাস্থানসহ সালাতে অবশ্যই আবৃত রাখতে হয় শরীরের এমন অংশ উন্মুক্ত হওয়া, ৬. কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে বেশি ফিরে যাওয়া, ৭. সালাতের মধ্যে পর পর অহেতুক কর্ম বেশি করা, ৮. পবিত্রতা নষ্ট হওয়া।

ব্যাখ্যা:

সালাতের শর্ত, রুকন, ওয়াজিব ও কথার সুন্নত ও কর্মগত সুন্নত আলোচনা করার পর সালাত বাতিল করে এমন বিষয়গুলো আলোচনা শুরু করেন। যাতে একজন মুসলিম সালাত বাতিল করে এমন বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে।

সালাত বাতিল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

এক- জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত কথা বলা। না জানার কারণে বা ভুলে কথা বললে তাতে সালাত বাতিল হয় না।কারণ, যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام».

“আমাদেরকে চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়।”[53]

দুই- হাসি। আল্লামা ইবনুল মুনযির বলেন, হাসি সালাত ভঙ্গকারী -এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত।

[53] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

তিন, চার: খাওয়া ও পান করা। আল্লামা ইবনুল মুনযির বলেন, আমার জানা মতে সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, ফরয সালাতে ইচ্ছাকৃত খেলে ও পান করলে তাকে অবশ্যই সালাত পূনরায় আদায় করতে হবে।

পাঁচ- লজ্জাস্থানসহ অন্যান্য সতর সালাতে অবশ্যই আবৃত রাখা। শরীরের এমন অংশ খোলা রাখা সালাত বিনষ্টকারী। কারণ, সালাতের শর্ত হলো, সতর ঢেকে রাখা আর যদি শর্ত না পাওয়া তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

ছয়- কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে বেশি ফিরে যাওয়া। কারণ, সালাতের শর্ত হলো, কিবলার দিকে মুখ করা। যেমন, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাত- সালাতের মধ্যে পর পর অহেতুক কর্ম বেশি করা। সকলের ঐকমত্যে অহেতুক কর্ম পরপর বেশি করলে সালাত বাতিল হবে, যেমনটি কাফী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি সামান্য হয় তবে সালাত ভঙ্গ হবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে সালাতে বহন করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন বহন করতেন, যখন সাজদাহ করতেন নিচে রাখতেন। এ ছাড়াও সূর্য গ্রহণের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সামনে আবার পিছনে আসা যাওয়া করেছেন।

আট- পবিত্রতা নষ্ট হওয়া। কারণ, সালাতের শর্ত হলো, পবিত্রতা। সুতরাং যখন অযু নষ্ট হবে, তখন সালাত বাতিল হবে।

দ্বাদশ দরস: অযুর শর্তসমূহ

অযুর শর্ত মোট দশটি:

১- ইসলাম, ২- বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, ৩- ভালো-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান থাকা, ৪- নিয়ত করা, ৫- এ নিয়ত অযু শেষ না হওয়া পর্যন্ত বজায় রাখা, ৬- অযু ওয়াজিব করে এমন কাজ বন্ধ করা, ৭- অযুর পূর্বে ইস্তেঞ্জা অথবা ইস্তেজমার করা, ৮- অযুর পানির পবিত্রতা ও তা ব্যবহারের বৈধতা থাকা, ৯- শরীরের চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছার প্রতিবন্ধকতা দূর করা, ১০- সর্বদা যার অযু ভঙ্গ হয় তার পক্ষে সালাতের সময় উপস্থিত হওয়া।

ব্যাখ্যা:

অযুঅযুর শর্তসমূহ:

১- ইসলাম, ২- বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, ৩- ভালো-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান, ৪- নিয়ত করা। সুতরাং কাফেরের অযু শুদ্ধ নয়, ইসলাম ছাড়া তার অযুঅযু গ্রহণযোগ্য নয়। পাগলের অযু শুদ্ধ নয়। কারণ, সে শরী'আতের বিধানের আওতামুক্ত। ছোটরা যারা ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না তাদের অযুঅযুও গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে যে অযুঅযুর নিয়ত করে না তার অযুও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, সে হাত-মুখ ধৌত করা, ঠাণ্ডা লাগার উদ্দেশ্যে, হাত পা থেকে ধুলো ময়লা বা চর্বি দুর করার উদ্দেশ্যে হাতমুখ ধৌত করলো।

৫- এ নিয়ত অযু শেষ না হওয়া পর্যন্ত বজায় রাখা, ৬- অযু ওয়াজিব করে এমন কাজ বন্ধ করা,

৮- পানির পবিত্রতা ও তা ব্যবহারের বৈধতা থাকা। অপবিত্র পানি দিয়ে অযু হবে না। অনুরূপভাবে পানি বৈধ হতে হবে। অবৈধ পানি যেমন, চুরি করা পানি, জোরজবরদস্তি করে নেওয়া পানি, বা অবৈধ পন্থায় প্রাপ্ত পানি দ্বারা অযু শুদ্ধ হবে না।

অযুর পূর্বে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার পর ইস্তেঞ্জা অথবা ইস্তেজমার করা।

শরীরের চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছার প্রতিবন্ধকতা দূর করা। যেমন, মাটি, আটা, মোম, নেলপালিশ ইত্যাদি, যাতে চামড়ায় সরাসরি পানি পৌঁছে।

সর্বদা যার অযু ভঙ্গ হয় তার পক্ষে সালাতের সময় উপস্থিত হওয়া। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাযায় আক্রান্ত মহিলাকে প্রতি সালাতের জন্য অযু করার নির্দেশ দেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ত্রয়োদশ দরস: অযুর ফরযসমুহ

অযুর ফরযসমূহ; এগুলো মোট ছয়টি:

১. মুখমণ্ডল ধৌত করা। নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া ও কুলি করা এর অন্তর্ভুক্ত।

২. কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা।

৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। কানও মাথার অন্তর্ভুক্ত।

৫. দুই পা টাখনুসহ ধোয়া।

৪. অযুর কার্যাবলী পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা ও

৬. এগুলো পরপর সম্পাদন করা।

উল্লেখ থাকে যে, মুখমণ্ডল, উভয় হাত ও পা তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। এভাবে তিনবার কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া মুস্তাহাব। ফরয মাত্র একবারই। তবে, মাথামাসেহ একাধিকবার করা মুস্তাহাব নয়। এ ব্যাপারে কতিপয় সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যা:

অযুর ফরয সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ٦﴾ [المائدة: ٦]

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

প্রথম ফরয: মুখমণ্ডল ধৌত করা, নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া ও কুলি করা এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার কারণ, এ দু’টি অঙ্গ চেহারার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া যতজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অযুর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন সবাই কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা

উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره»

“যখন কোনো ব্যক্তি অযু করে, সে যেন নাকে পানি দেয় অতঃপর নাক ঝেড়ে ফেলে”।[54]

অযুর দ্বিতীয় ফরয: দুই হাত ধোয়া। আল্লাহ তা‘আলাতা‘আলা বলেন,

وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ

কনুইসহ ধোয়া ফরয। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুতে কনুই ধুইতেন।

তৃতীয় ফরয: মাথা মাসেহ করা। আর কান মাথার অংশ হিসেব ধর্তব্য হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الأذنان من الرأس»

“উভয় কান মাথার অংশ”।[55]

কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুতে কান ও মাথা মাসেহ করতেন।

চতুর্থ ফরয: দুই পা টাখনুসহ ধোয়া। কারণ আল্লাহ বলেন,

وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ

পঞ্চম ফরয: অযুর কার্যাবলী পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা অযুর কার্যসমূহকে ধারাবাহিক উল্লেখ করেছেন। দুই ধোয়ার বস্তুর মাঝে মাসেহ করার একটি বিষয়কে নিয়ে এসেছেন। একই ধরনের বস্তুদের মধ্যখানে অন্য বস্তু উল্লেখ করে ভিন্ন করে দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতিফলিত হয় যে, তরতীব বা

---

[54] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী।

[55] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৪৪।

ধারাবাহিকতা জরুরী। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অযুর পদ্ধতি বর্ণনায় এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। আর তার কথা ও আমল সবই কুরআনের ব্যাখ্যা।

ষষ্ঠ ফরয: অযুর কর্মগুলো পরপর সম্পাদন করা। এমন করবে না যে, একটি ধোয়ার পর তা শুকিয়ে যায়। প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন তার উম্মতের শরী'আতের বিধানের প্রবর্তক এবং ব্যাখ্যাদানকারী। আর যত জন তার অযুর পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন তারা সবাই পরপর সম্পাদন করার কথাই বলেছেন।

চৌদ্দতম দরস: অযু ভঙ্গকারী বিষয়

অযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ: আর তা হলো মোট ছয়টি:

১. মূত্রনালি ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।

২. দেহ থেকে স্পষ্ট অপবিত্র কোনো পদার্থ নির্গত হওয়া।

৩. নিদ্রা বা অন্য কোনো কারণে জ্ঞান হারা হওয়া।

৪. কোনো আবরণ ব্যতীত সম্মুখ বা পিছনের দিক থেকে হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করা।

৫. উটের মাংস ভক্ষণ করা এবং

৬. ইসলাম পরিত্যাগ করা। আল্লাহ পাক সব মুসলিমমুসলিমদের এ থেকে আশ্রয় দিন।

ব্যাখ্যা:

লেখক পূর্বের দরসে অযু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখন তিনি অযু ভঙ্গের কারণসমূহ আলোচনা করবেন। যাতে মুসলিমদের জন্য দীনের বিধান সু-স্পষ্ট হয়ে যায়।

অযু ভঙ্গের কারণ নিম্নরূপ:

এক- ১. মূত্রনালি ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া কম হউক বা বেশি, তা দুই ধরনের হয়:

প্রাকৃতিক: যেমন পেশাব পায়খানা। আল্লামা ইবনু আব্দুল বার রহ. বলেন, এতে মতবিরোধ নেই যে, এতে অযু ভেঙ্গে যাবে। তা‘আলা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ

অস্বাভাবিক: পাথর, কৃমি-পোকা চুল-পশম ইত্যাদি। তাতেও অযু ভঙ্গ হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাযা তথা স্রাবগ্রস্তা মহিলাকে বলেন,

«توضئي لكل صلاة»

“প্রতি সালাতের জন্য অযু কর”।[56]

এ ধরনের মহিলার রক্তস্রাব অস্বাভাবিক। (তারপরও তাকে অযু করতে বলা হয়েছে; সুতরাং অস্বাভাবিক হলেও অযু নষ্ট হবে।) তাছাড়া এসব তো দুই রাস্তা দিয়েই বের হয়েছে, তাই তাতে অযু নষ্ট হয়ে যাবে।

দুই- দেহ থেকে স্পষ্ট অপবিত্র কোনো পদার্থ নির্গত হওয়া। এ ধরনের নাপাকি বেশি হলে অযু নষ্ট হয়। কম হলে নয়। যেমন, রক্ত যখন বেশি হবে অযু নষ্ট হয়, কম হলে নয়। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রক্ত সম্পর্কে বলেন, ‘যখন অতিরিক্ত হবে, তাকে আবার অযু করতে হবে।’ আর আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ফোঁড়াকে চাপ দিলে তা থেকে সামান্য রক্ত বের হলো, কিন্তু তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করলেন; অযু করলেন না। সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এ দুই সাহাবীর বিরোধিতা না করায় বিষয়টির ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

তিন- নিদ্রা বা অন্য কোনো কারণে জ্ঞানহারা হওয়া। যেমন পাগল, মাতাল ও নেশাগ্রস্ত হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»

“জাগ্রত থাকা পায়ু পথের সুরক্ষা, যে ঘুমায় সে যেন অযু করে নেয়”।[57]

পাগল মাতাল ও জ্ঞানহারা হওয়া ঘুম হতেও মারাত্মক, তাতে অযু ভঙ্গ হওয়া আরও অধিক জরুরী।

চার- কোনো আবরণ ব্যতীত সম্মুখ বা পিছনের দিক থেকে হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من مس فرجه فليتوضأ»

---

[56] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৩; নাসায়ী, হাদীস নং ১২৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮২; নাসায়ী, হাদীস নং ৩৬৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬২৪; মুসনাদে আহমদ ৬/২০৪।

[57] আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৩; ইবন মাজাহ, ৪৭৭; মুসনাদে আহমদ ১/১১১।

“যে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সে যেন অযু করে নেয়।”[58]

পাঁচ- উটের মাংস ভক্ষণ করা। জাবির ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«أن رجلا سأل النبي أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل»

“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি উটের গোশত খেয়ে পুনরায় অযু করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ উটের গোশত খেলে তোমরা আবার অযু কর”।[59]

৬. ইসলাম পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তা‘আলা সব মুসলিমদেরকে এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক কাজ থেকে পানাহ দান করুন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر: ٦٤]

“যদি তুমি শির্ক কর, তোমার আমল নষ্ট হয় যাবে”।

মূলপাঠ:

বিঃদ্রঃ মুর্দার গোসল দেওয়ার ব্যাপারে সঠিক মত হলো যে, এতে অযু ভঙ্গ হয় না। অধিকাংশ আলেমের এ অভিমত। কারণ, অযু ভঙ্গের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তবে যদি গোসলদাতার হাত কোনো আবরণ ব্যতিরেকে মুর্দারের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে তার ওপর অযু ফরয হয়ে যাবে। কোনো আবরণ ব্যতিরেকে মুর্দারের লজ্জাস্থানে যাতে হাত স্পর্শ না করে গোসলদাতার অবশ্যই সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এইরূপ স্ত্রীলোক স্পর্শে কোনো ভাবেই অযু ভঙ্গ হয় না, তা কামভাব সহকারে হউক বা বিনা কামভাবে হউক। আলেমগণের সঠিক অভিমত এটাই। কোনো

---

[58] তিরমিযী, হাদীস নং ৮২; নাসায়ী, হাদীস নং ৪৪৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৭৯; মুসনাদে আহমদ ৬/৪০৬।

[59] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৬০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৯৫; মুসনাদে আহমদ ৫/৯৮।

কিছু বের না হলে অযু নষ্ট হয় না। এর প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার পর সালাত পড়েছেন অথচ পুনরায় অযু করেন নি। উল্লেখ্য যে, সূরা আন-নিসা ও সূরা আল-মায়েদার দুই আয়াতে যে স্পর্শের কথা বলা হয়েছে "অথবা তোমরা স্ত্রীলোক স্পর্শ করেছ" এর দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আলেমগণের সঠিক অভিমত এটিই । ইবন আব্বাসসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল আলেমেরও এ অভিমত। আল্লাহ তা'আলাই আমাদের তাওফীক দাতা।

পঞ্চদশ দরস: ইসলামী চরিত্র

প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে ইসলামী চরিত্রে বিভূষিত হওয়া

ইসলামী চরিত্রের মধ্যে রয়েছে সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা, লজ্জা, সাহস, দানশীলতা, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারামকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকা, প্রতিবেশির সাথে সদ্ব্যবহার, সাধ্যমত অভাবগ্রস্ত লোকের সাহায্য করা এবং অন্যান্য সৎচরিত্রাবলী যেগুলোর বৈধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠদশ দরস: ইসলামী আদব-কায়দা

ইসলামী আদব-কায়দায় শিষ্টাচার হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে সালাম প্রদান, হাসিমুখে সাক্ষাৎ প্রদান, ডান হাতে পানাহার করা, পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচি দেওয়ার পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা এবং এর উত্তরে অপরজন কর্তৃক 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন) বলা। মসজিদে বা ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, সফরকালে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও ছোট-বড় সকলের সাথে ব্যবহার কালে শরী'আতের আদাবসমূহ পালন করে চলা, নবজাত শিশুর জন্মে অভিনন্দন জানানো, বিবাহ উপলক্ষে বরকতের দো'আ করা এবং বিপদে ও মৃত্যুতে সান্তনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করাসহ বস্ত্র পরিধান ও তা খোলা এবং জুতা ব্যবহারের সময় ইসলামী আদাব-কায়দা মেনে চলা।

ব্যাখ্যা:

ফিকহে আকবর ও ফিকহে আসগরের আহকাম বর্ণনার লেখক উম্মতের প্রতিটি মুসলিমের জন্য কিছু আদব আখলাকের বর্ণনা আরম্ভ করেন। সুতরাং হে মুসলিম ভাই! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যাবতীয় কল্যাণকর আমল করার

তাওফীক দিন, যাতে তুমি মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পার এবং ইসলামী আখলাকের অনুকরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হও। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানকারী প্রমাণাদি অনেক। যদি দীর্ঘ লম্বা হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তবে তা আলোচনা করতাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তারা আখলাক ছিল কুরআন। তিনি সততা, আমানতদারিতা, সাহসিকতা, দানশীলতা ও হারাম থেকে বাঁচা ইত্যাদি বিষয়ে ছিলেন সু-প্রসিদ্ধ। তার সাহাবীগণ তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

প্রথম যুগে মুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে অন্যদের লেনদেনের কারণে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইসলামের বিস্তার লাভ করে। তারা ছিলেন সৎ এবং বিশ্বাসী। সুতরাং হে মুসলিম ভাই! প্রথমে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি, তারপর তোমার উপর আশা করি যে তুমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হও যারা এ সব গুণে গুণান্বিত। তুমি কাজে ও কর্মে সৎ হও, আমানতদার হও, পাক-পবিত্র হও, লজ্জাবান হও, সাহসী হও। তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার কর। তার হক অনেক। অভাবীদের সাহায্য কর। কারণ আল্লাহ ঐ বান্দার সহযোগিতা করেন যে আল্লাহর বান্দাদের সহযোগিতা করেন। পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দাও। সালাম দেওয়া সুন্নাত, মহব্বত বাড়ে, দূরত্ব ও ভীতি দূর করে। হাসি মুখে মুসলিম ভাইদের সাথে সাক্ষাত করবে এতে তুমি সদকা করার সাওয়াব পাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক নির্দেশনা পালন করবে। ডান হাত দিয়ে খাবে ও পান করবে। মসজিদে প্রবেশের সুন্নতগুলো আদায় করবে। ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বাম দিয়ে বের হবে। হাদীসে বর্ণিত দো'আ পাঠ করবে। ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো'আ পড়বে। আল্লাহর হিফাযতে নিরাপদ থাকবে এবং তিনিই রক্ষা করবেন। সফরে বের হওয়ার সময় সফরের দো'আ পড়তে ভুল করবে না। মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মনে রাখবে, তোমার ওপর তাদের

অধিকার অনেক। এতে কোনো প্রকার অবহেলা করবে না। অন্যথায় লজ্জিত হতে হবে। আর পরবর্তী সময়ের লজ্জা কোনো কাজে লাগে না। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীদের প্রতি দয়া করতে ভুল করবে না। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করবে। তা'আলামহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥﴾ [البقرة: ١٩٥]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق»

"তোমরা তোমাদের সম্পদ নিয়ে মানুষের মন জয় করতে সমর্থ হবে না, তবে উচিৎ তোমরা যেন, হাসি মুখ ও ভালো চরিত্র নিয়ে তাদের জয় কর।"

অনুরূপভাবে মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.»

"তুমি যেখানেই থাক আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, কোনো মন্দ আমলের পর ভালো কাজ কর, তা মন্দকে মিটিয়ে দিবে আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর।"[60]

কবি বলেন,

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم .... فطالما استعبد الإنسان إحسان

"মানুষের প্রতি দয়াদ্র হও কিনতে পারবে তার অন্তর, সব সময় তো দয়ার মাধ্যমেই মানুষকে জয় করা যায়।"

নবজাতকের ব্যাপারে খুশী প্রকাশ করে মুবারকবাদ জানাও, তাদের জন্য হাদীসে বর্ণিত দো'আ কর। বিপদগ্রস্ত লোকদের সহযোগিতা কর, তাতে তোমার সাওয়াব মিলবে। মোট কথা, ইসলামী শিষ্টাচার ও আদাব আখলাক মেনে চলবে। খারাপ ও মন্দ আখলাক থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহ আমাদেরকে

---

[60] তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৮৭; মুসনাদে আহমদ ৫/১৫৩; দারেমী, হাদীস নং ২৭৯১।

এবং তোমাকে সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা শরী'আতের আদাব-আখলাক বজায় রাখে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, দো'আ কবুলের ব্যাপারে উপযুক্ত সত্তা।

সপ্তদশ দরস: শির্ক ও বিভিন্ন প্রকার পাপ থেকে সতর্ক থাকা এবং অপরকে সতর্ক করা

তন্মধ্যে সাতটি ধ্বংসকারী পাপ অন্যতম। এগুলো হলো:

১। আল্লাহর সাথে শির্ক করা, ২। জাদু করা, ৩। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করে রেখেছেন, ৪। এতিমের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করা, ৫। সুদ গ্রহণ করা, ৬। যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা এবং ৭। সৎচরিত্রা মুমিনা সরলমনা নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।

বড় বড় পাপের মধ্যে আরও রয়েছে; যেমন: মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা, মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মানের ওপর যুলুম করা ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'আলা অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা:

লেখক রহ. মুসলিমদের করনীয় আখলাক ও আমলের বর্ণনার পর তিনি এ দরসে শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনসহ অন্যান্য গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। তার মধ্যে সাতটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক গুনাহের আলোচনা করছেন, যাতে উম্মত তা থেকে সর্তক হয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমরা সাতটি বিধ্বংসী বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সেগুলো কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, জাদু, নিষিদ্ধ কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল

ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং চারিত্রিকভাবে পবিত্রা নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।[61]

« اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »

اجتنبوا এ অর্থ তোমরা দূরে থাক। الموبقات এর অর্থ ধ্বংসকারী, মুবিকাত বলে নাম করণ করার কারণ, এ ধরনের অপরাধ অপরাধীকে দুনিয়াতেও ধ্বংস করে দেয় তার ওপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আরোপ করা দ্বারা, আর আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি দ্বারা। শির্ক সম্পর্কে আলোচনা পূর্বের দরসে অতিবাহিত হয়েছে।

জাদু- আর তা হচ্ছে, তাবীজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক ও এমন কিছু আমল যা মানুষের আত্মা ও দেহ উভয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। এর দ্বারা অনেকেই রুগী হয়, মারা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। আবার কোনো কোনো জাদু এমনও আছে যা কিছু মানুষের চোখকে জাদু করে দেখায়, যার কোনো বাস্তবতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلۡقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَلۡقَىٰ ٦٥ قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ ٦٦ ﴾ [طه: ٦٥، ٦٦]

জাদু হারাম; কারণ, জাদু আল্লাহর সাথে কুফরি করা। যা ঈমান ও তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

জাদুকরের শাস্তি হলো হত্যা।

---

[61] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৯; নাসায়ী, হাদীস নং ৩৬৭১; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮৭৪।

উল্লেখিত যে সব বিষয়গুলো বর্ণিত হলো এ গুলো সবই হারাম ও কবিরা গুনাহ। একজন মুসলিমের দায়িত্ব সে এ সব বড় বড় গুণাহ থেকে বেঁচে থাকবে। যদি কোনো কারণে এ ধরনের কোনো গুণাহ সংগঠিত হয় তবে তাকে অবশ্যই তাওবা করতে হবে। লজ্জিত হতে হবে এ গুনাহ ও অন্যান্য সব ধরনের গুনাহ দ্বিতীয়বার না করার অঙ্গীকার করতে হবে। ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। মুসলিম ভাইকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে ভয় দেখাবে এবং গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবে। কারণ, এটি নেক আমল, তাকওয়া, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের ওপর বারণ করা এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার ওপর সহযোগিতা। আর এটাই হলো নবীদের ত্বরীকা। আল্লাহ তা'আলাতা'আলা তার স্বীয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে বলেন,

﴿ قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ ﴾ [يوسف: ١٠٨] আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং সকল মুসলিমকে সব ধরনের গুনাহের কর্ম থেকে হিফাযত করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে আমাদের আল্লাহর চিরন্তন বাণীর ওপর অটুট থাকার তাওফীক দিন। অবশ্যই আমার রব সর্বশ্রোতা ও দো'আ কবুলকারী।

অষ্টাদশ দরস: মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন

মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থাপনা ও জানাযার সালাত পড়া।

নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

মৃতের জন্য করণীয়:

প্রথমত: কোনো ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হলে তাকে কালেমা তালকীন দিবে। অর্থাৎ তাকে কালেমা স্মরণ করিয়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

“তোমরা তোমাদের মূমুর্ষ ব্যক্তিদেরকে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু’ শিক্ষা দাও।”[62]

এ হাদীসে মৃতদের বলতে ঐ সব মরণাপন্ন লোকদের কথা বলা হয়েছে যাদের ওপর মৃত্যুর লক্ষণাদি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত: কোনো মুসলিমের মৃত্যু নিশ্চিত হলে তার চক্ষুদ্বয় মুদিত এবং মুখ বন্ধ করে দিতে হয়।

তৃতীয়ত: মৃত মুসলিমনের গোসল করানো ওয়াজিব। তবে যুদ্ধের ময়দানে মৃত শহীদের গোসল করানো হয় না, না তার ওপর জানাযার সালাত পড়া হয়; বরং তার পরিহিত বস্ত্রেই তাকে দাফন করা হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে মৃতদের গোসল করান নি এবং তাদের ওপর সালাতও পড়েন নি।

চতুর্থত: মৃতের গোসল করানোর পদ্ধতি। গোসল করানোর সময় প্রথমে মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান ডেকে নিবে। তারপর তাকে একটু উঠিয়ে আস্তে আস্তে তার পেটের ওপর চাপ দিবে। পরে গোসলদানকারী ব্যক্তি নিজের হাতে একটা নেকড়া বা অনুরূপ কিছু পেঁচিয়ে নিবে, যাতে মৃতের মলমুত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিতে পারে। তারপর মৃত ব্যক্তিকে সে সালাতের অযু করাবে এবং

---

[62] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১৬।

তার মাথা ও দাঁড়ি বরই পাতা বা অনুরূপ কিছুর পানি দিয়ে ধৌত করবে। অতঃপর তার দেহের ডান পার্শ্ব, তারপর বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করবে। প্রতিবার হাত দিয়ে পেটের ওপর চাপ দিবে। কিছু বের হলে তা ধৌত করে নিবে এবং তুলা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে স্থানটি বন্ধ করে রাখবে। এতে যদি বন্ধ না হয় তাহলে পোড়ামাটি অথবা আধুনিক কোনো ডাক্তারি পদ্ধতি অনুসারে যেমন প্লাস্টার বা অন্য কিছু দিয়ে বন্ধ করতে হবে এবং পুনরায় অযু করাবে। যদি তিনবারে পরিষ্কার না হয় তাহলে পাঁচ থেকে সাতবার ধৌত করাবে। এরপর কাপড় দ্বারা শুকিয়ে নিবে এবং সাজদার অঙ্গ ও অপ্রকাশ্য স্থানসমূহে সুগন্ধি লাগাবে। আর যদি সকল শরীরে সুগন্ধি লাগানো যায় তাহলে আরও ভালো। এই সাথে তার কাফনগুলো ধুপ-ধুনা দিয়ে সুগন্ধি করে নিবে। যদি তার গোফ বা নখ লম্বা থাকে তা কেটে নিবে, তবে চুল বিন্যাস করবে না। স্ত্রীলোক হলে তার চুল তিন গুচ্ছে বিভক্ত করে পিছনের দিকে ছেড়ে রাখবে।

পঞ্চমত: মৃতের কাফন

সাদা বর্ণের তিনখানা কাপড়ে পুরুষের কাফন দেওয়া উত্তম। জামা বা পাগড়ী এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দেওয়া হয়েছিল। মৃতকে এর ভিতরে পর্যায়ক্রমে রাখা হবে। একটি জামা, একটি ইযার ও একটা লিফাফার দ্বারা কাফন দিলেও চলে। স্ত্রীলোকের কাফন পাঁচ টুকরা কাপড়ে দেওয়া হবে, সেগুলো হলো চাদর, মুখাবরণ, ইযার ও দুই লিফাফা। ছোট বালকের কাফন এক থেকে তিন কাপড়ের মধ্যে দেওয়া যায় এবং ছোট বালিকার কাফন এক জামা ও দুই লিফাফায় দেওয়া হয়। সকলের পক্ষে একখানা কাপড়ই ওয়াজিব যা মৃতের সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে রাখতে পারে। তবে মৃত ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় হলে তাকে বরই পাতার সিদ্ধ পানি দিয়ে গোসল দিতে হয় এবং তাকে তার ইযার ও চাদর অথবা অন্য কাপড়ে কাফন দিলেও চলবে। তবে তার মস্তক ও চেহারা আবৃত করা যাবে না বা তার

কোনো অঙ্গ সুগন্ধিও লাগানো যাবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। আর যদি মুহরিম স্ত্রীলোক হয় তাহলে অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় তার কাফন হবে। তবে তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো যাবে না এবং নেকাব দিয়ে চেহারা বা মোজা দিয়ে তার হস্তদ্বয় কাফনের কাপড় দিয়েই আবৃত করা হবে। ইতোপূর্বে মেয়ে লোকের কাফন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠত: মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় যাকে অসিয়্যত করে যাবে সেই হবে তার গোসল, দাফন করা ও তার ওপর জানাযার সালাত পড়ার অধিকতর হকদার। তারপর তার পিতা, তারপর তার পিতামহ, তারপর তার বংশে অধিকতর ঘনিষ্ঠ লোকের হক হবে। এভাবে স্ত্রীলোক যাকে অসিয়্যত করবে সেই হবে উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদনের অধিকতর হকদার। তারপর তার মাতা, তারপর দাদী, তারপর পর্যায়ক্রমে বংশের অধিকতর ঘনিষ্ঠ মেয়েরা হবে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে একে অপরের গোসল দিতে পারে। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াআল্লাহু ‘আনহুকে তার স্ত্রী গোসল দিয়েছিলেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার স্ত্রী ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে গোসল দিয়েছিলেন।

সপ্তমত: মৃতের ওপর সালাত পড়ার পদ্ধতি: (জানাযার সালাত) জানাযার সালাতে চার তাকবীর দেওয়া হয়। প্রথম তাকবীরের পর সূরা আল-ফাতিহা পড়া হয়। এর সাথে যদি ছোট কোনো সূরা বা দু এক আয়াত কুরআন মাজীদ পড়া হয় তাহলে ভালো। কারণ, এ সম্পর্কে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এরপর দ্বিতীয় তাকবীর দেওয়া হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর সে দুরূদ পড়তে হয় যা সালাতে তাশাহুহুদের (আত্তাহিয়্যাতুর) সাথে পড়া হয়। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিম্ন লিখিত দো‘আ করা হয়:

«اَللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللهُمَّ مَنْ أَحيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَان- اَللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ الْجَنَّةَ – وَأَعِذْهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ] وَأَفْصِحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ- اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تُضِلْنَا بَعْدَه»

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলী হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদীনা ওয়া গাইবিনাওয়া সাগিরীনা ওয়াকাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছা-না। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়্যিহী-আলাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু, ওয়া আফিহি, ওয়া আ'ফু আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহুওয়াছ্ছি' মুদকালাহু, ওয়া আগছিলহু বিলমা-ঈ ওয়াস্ সালজি ওয়াল বারদি। ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতয়া কামা য়ূনাক্কাস্ সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ্দানাছি, ওয়া আবদিলহু দারান কাইরাম্ মিন্ দারিহী ওয়া আহলান কাইরাম্ মিন আহলিহী, ওয়া যাওজান কায়রাম মিন্ যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আইযহু মিন আযাবিল ক্কাবরি (ওয়া আযাবিন্নারি), ওয়া আফসিহ লাহু ফি ক্কাবরিহি ওয়া নাওয়ীর লাহু ফিহি, আল্লাহুম্মা লা তুহরিম না ওয়া জরাহু তুজিল্লানা বা'দাহু।"

"হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত, ও অনুপস্থিত, ছোট, ও বড়, নর ও নারীদিগকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! তুমি এই মৃত্যুকে ক্ষমা করো, তার ওপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মার্জনা করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটি প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা

বিমুক্ত করা হয়। তার এ (দুনিয়ার) বাসস্থানের বদলে উত্তম বাসস্থান প্রদান করো, তার এ পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই স্ত্রী থেকে উত্তম স্ত্রী দান কর, তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং তার জন্য তা আলোকিত করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।

অতঃপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে ডান দিকে এক সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয়।

জানাযার সালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠানো মুস্তাহাব। যদি মৃত ব্যক্তি পুরুষ হয় তাহলে اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُ...الخ বলবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি মহিলা হয় তাহলে এর পরিবর্তে اَللهُمَّ اغْفِرْلَهَا....الخ অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম যোগ করে পড়তে হয়। আর যদি মৃতের সংখ্যা দুই হয় তাহলে اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُمَا ..الخ এবং এর বেশি হলে اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ .... الخ অর্থাৎ সংখ্যা হিসেবে সর্বনাম ব্যবহার করতে হয়।

মৃত যদি শিশু হয় তাহলে উপরোক্ত মাগফিরাতের দো'আর পরিবর্তে এই দো'আ পড়া হবে:

«اللهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَّذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ . وَشَفِيْعًا مُجَابًا . اللهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا. وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجْعَلْهُ فِيْ كِفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ»

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মাজ্ আলহু ফারাতান ওয়া জুখরান লিওয়ালিদাইহি, ওয়া শাফীআন মুবা। আল্লাহুম্মা ছাক্কিলবিহী মাওয়াযীনাহুমা- ওয়া আ'জিম বিহী উজু-রাহুমা-, ওয়া আলহিকুহু বিসা-লিহিল মু'মিনীন ওয়া আজআলহু ফী কিফা-লাতি ইব্রাহিমা আলাইহিস সলাম, ওয়াক্কিহী বিরাহমাতিকা আযাবাল জাহীম।"

অর্থ: “হে আল্লাহ ! এই বাচ্ছাকে তার পিতা-মাতার জন্য “ফারাত” (অগ্রবর্তী নেকী) ও “যুখর” (সযত্নে রক্ষিত সম্পদ) হিসাবে কবুল করো এবং তাকে এমন সুপারিশকারী বানাও যার সুপারিশ কবুল করা হয়। হে আল্লাহ ! এই (বাচ্চার) দ্বারা তার পিতা-মাতার সওয়াবের ওজন আরও ভারী করে দাও এবং এর দ্বারা তাদের নেকী আরও বড় করে দাও। আর একে নেক্কার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও এবং ইব্রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিম্মায় রাখো, একে তোমার রহমতের দ্বারা জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।”

সুন্নাত হলো, ইমাম মৃত পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াবে এবং স্ত্রীলোক হলে তার দেহের মধ্যাংশ বরাবর দাঁড়াবে।

মৃতের সংখ্যা একাধিক হলে পুরুষের মৃতদেহ ইমামের নিকটবর্তী থাকবে এবং স্ত্রীলোকের মৃতদেহ কিবলার নিকটবর্তী থাকবে। তাদের সাথে বালক-বালিকা হলে পুরুষের পর স্ত্রীলোকের আগে বালক স্থান পাবে, তারপর স্ত্রীলোক এবং সর্বশেষে বালিকার স্থান হবে। বালকের মাথা পুরুষের মাথা বরাবর এবং স্ত্রীলোকের মধ্যাংশ পুরুষের মাথা বরাবর রাখা হবে। এভাবে বালিকার মাথা স্ত্রীলোকের মাথা বরাবর এবং বালিকার মধ্যাংশ পুরুষের মাথা বরাবর রাখা হবে। সব মুছাল্লীগণ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তবে যদি কোনো লোক ইমামের পিছনে দাঁড়াবার স্থান না পায় তাহলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াতে পারে।

অষ্টমত: মৃতের দাফন প্রক্রিয়া:

শরীয়ত মতে কবর একজন পরুষের মধ্যভাগ পরিমাণ গভীর এবং কেবলার দিক দিয়ে লহদ (বগলী কবর) আকারে করতে হবে। মৃতকে তার ডান পার্শ্বের ওপর সামান্য কাত করে লাহাদে শায়িত করবে। তারপর কাফনের গাঁইট খুলে দিবে, তবে কাপড় খুলবে না, বরং এভাবেই ছেড়ে দিবে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক আর নারী হোক কবরে রাখার পর তার চেহারা উন্মুক্ত করা যাবে না। এরপর ইট খাড়া করে সেগুলো কাদা দিয়ে জমাট করে রাখবে, যাতে ইটগুলো স্থির থাকে এবং মৃতকে পতিত মাটি থেকে রক্ষা করে।

যদি ইট না পাওয়া যায় তাহলে অন্য কিছু যেমন, তক্তা, পাথর খণ্ড অথবা কাঠ মৃতের ওপর খাড়া করে রাখবে যাতে মাটি থেকে তাকে রক্ষা করে। তারপর এর ওপর মাটি ফেলা হবে এবং এই মাটি ফেলার সময়:

«بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ»

"আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের ওপর রাখলাম" বলা মুস্তাহাব। কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করবে এবং এর উপরে সম্ভব হলে কঙ্কর, পানি ছিটিয়ে দিবে।

মৃতের দাফন করতে যারা শরীক হবে তাদের পক্ষে কবরের পার্শ্বে দাড়িয়ে মৃতের জন্য দো'আ করার বৈধতা রয়েছে। এর প্রমাণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাফন কাজ শেষ করতেন তখন তিনি কবরের পার্শে দাঁড়াতেন এবং লোকদের বলতেন "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাতে কামনা কর এবং ঈমানের ওপর ছাবেত থাকার জন্য দো'আ কর; কেননা, এখনই তার সওয়াল-জওয়াব শুরু হচ্ছে।"

নবমত: দাফনের পূর্বে যে মৃতের ওপর সালাত পড়ে নেই সে দাফনের পর সালাত পড়তে পারে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন। তবে এ সালাত একমাস সময়ের মধ্যে হতে হবে, এর বেশি হলে কবরের ওপর সালাত পড়া বৈধ হবে না। কেননা, দাফনের একমাস পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মৃতের ওপর সালাত পড়েছেন এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায় না ।

দশমত: উপস্থিত লোকদের জন্য মৃতের পরিবার-পরিজনের পক্ষে খাদ্য প্রস্তুত করা জায়েয নয়। প্রসিদ্ধ সাহাবী জারীর ইবন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: "মৃতের পরিবার-পরিজনের নিকট সমবেত হওয়া এবং দাফনের পর খাদ্য প্রস্তুত করাকে আমরা মৃতের ওপর 'নিয়াহা' (বিলাপ) বলে গণ্য করতাম।"(এ হাদীস ইমাম আহমদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।) তবে মৃতের পরিবার-পরিজনের জন্য বা তাদের মেহমানদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত

করতে আপত্তি নেই। এভাবে তাদের জন্য মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে খাদ্য সরবরাহ করা জায়েয আছে। এর প্রমাণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন জা'ফর ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি স্বীয় পরিবারবর্গকে বললেন: "জাফর পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে পাঠাও।" আরও বললেন যে, "তাদের ওপর এমন মুসিবত নেমে আসছে যা তাদেরকে খাদ্য প্রস্তুত থেকে বিরত করে ফেলেছে।"

মৃতের পরিবার-পরিজনের জন্য যে খাদ্য পাঠানো হয় তা খাওয়ার জন্য প্রতিবেশীদের বা অন্যদের আহবান করা বৈধ। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

একাদশতম: কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী ব্যতীত অপর কোনো মৃতের ওপর তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ জায়েয নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর ওপর চারমাস দশ দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ ওয়াজিব। তবে গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত শোক পালন করতে হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস আছে।

পুরুষের পক্ষে কোনো মৃতের ওপর সে আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় হোক শোক পালন জায়েয নয়।

দ্বাদশতম: সময়ে সময়ে পুরুষদের পক্ষে কবর যিয়ারত করা সুন্নাত এবং এর উদ্দেশ্য হবে মৃতদের জন্য দো'আ, রহমত কামনা, মরণ এবং মরণোত্তর অবস্থা স্মরণ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা, তা তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে" (সহীহ মুসলিম)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন যে, তারা যখন কবর যিয়ারতে যাবে তখন যেন বলে:

«اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ»

উচ্চারণ: “আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ্ দিয়ারি মিনাল মু’মিনীন ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইন্‌শা আল্লাহু বিকুম লাহিকুন। নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল ‘আফিয়াহ, ইয়ার হামুল্লাহুল্ মুস্‌তাকদিমীনা ওয়াল মুস্‌তাখিরীন।”

অর্থ: “তোমাদের প্রতি সালাম হোক হে কবরবাসী মু’মিন-মুসলিমগণ, ইনশা আল্লাহ আমরাও অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি, আমরা আমাদের এবং তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ অগ্রগামী পশ্চাৎগামী আমাদের সবার প্রতি দয়া করুন।”

মেয়ে লোকের পক্ষে কবর যিয়ারত বৈধ নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারীনী নারীদের অভিশাপ করেছেন। এতদ্ব্যতীত মেয়েদের কবর যিয়ারতে ফেতনা ও অধৈর্য সৃষ্টির ভয় রয়েছে। এভাবে মেয়েদের পক্ষে কবর পর্যন্ত জানাযার অনুগমন করাও বৈধ নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এথেকে বারণ করেছেন। তবে মসজিদে বা অন্য কোনো স্থানে মৃতের ওপর জানাযার সালাত পড়া নারী পুরুষ সকলের জন্য বৈধ।

সাধ্যমত দরসসমূহ সংকলনের কাজ এখানেই সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের প্রিয় নবী, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه.